আল্লাহ্‌র নামে
নরহত্যা

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ)
ইমাম ঃ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

ভাষান্তর ঃ শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশকাল ঃ

শ্রাবণ	১৪০২
রবিউল আউয়াল	১৪০৭
জুলাই	১৯৯৫

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
ঢাকা

Bangla Version of the last 4 Articles from
'Murder in the Name of Allah'
By Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV.
Imam : World-wide Ahmadiyya Muslim Jamaat,

Translated by Shah Mustafizur Rahman.

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

দু'টি কথা

নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) খলীফা হওয়ার প্রায় তিন দশক পূর্বে 'মযহব কি নাম পর খুন' নামে একটি বই উর্দূতে রচনা করেন। বাংলা ভাষায় 'ধর্মের নামে রক্তপাত' শিরোনামে বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে Murder in the Name of Allah নামে ইংরেজীতে আরো তিনটি নূতন অধ্যায় যুক্ত হয়ে বইটি মার্জিত এবং বর্দ্ধিত কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে। এই নূতন তিনটি অধ্যায় মূল উর্দূ গ্রন্থে বা বাংলা সংস্করণে নেই। বর্তমানে ঐ তিনটি অধ্যায়কে একটি নূতন পুস্তক রূপে প্রকাশ করা হল। প্রকৃত পক্ষে বর্তমান পুস্তকটিকে 'ধর্মের নামে রক্তপাত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বলা যেতে পারে।

আল্লাহতা'লা পুস্তকের এই খণ্ডটির দ্বারা এদেশে উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করুন, আমীন।

খাকসার

(আলহাজ্জ্ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী)
ন্যাশনাল আমীর
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ঢাকা
১৯/৭/৯৫ইং

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

'Murder in the Name of Allah' - ইংরেজী ভাষাভাষী জ্ঞানান্বেষী পাঠকের কাছে একটি সমাদৃত গ্রন্থ। এর প্রণেতা খলীফাতুল মসীহ্ ৪র্থ, হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ সাহেব (আইঃ), ইমামঃ নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত।

মহামান্য গ্রন্থকার ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানে আহ্‌মদী বিরোধী দাঙ্গার পরে 'মযহব কি নাম পর খুন' শীর্ষক একটি অতি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করেন। বাংলায় ও ইন্দোনেশিয়ায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাংলা নাম 'ধর্মের নামে রক্তপাত'। অনুবাদ করেছেন আমাদের জামা'তের একজন ওলীতুল্য ব্যক্তি মোহ্‌তারম মৌঃ এ. এইচ. এম আলী আনওয়ার সাহেব (মরহুম), ভূতপূর্ব সম্পাদক, পাক্ষিক আহ্‌মদী। শ্রদ্ধেয় আলী আনওয়ার সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বহু ভাষায় অনূদিত অতুলনীয় গ্রন্থ 'ইসলামী উসুল কি ফিলসফী' সহ কয়েকটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

'মযহব কি নাম পর খুন' পুস্তকটি রচিত হয়েছিল ১৯৫৩ -এর দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে। অতঃপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। সেই দাঙ্গাজনিত শোক–তাপ এখন প্রায় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। কিন্তু যে–সকল কারণে তখন জামাতে ইসলামী, আহরার ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীরা দাঙ্গা সংঘটিত করেছিল সেগুলোর নিরসন হয়নি, সবই বিদ্যমান রয়েছে এখনও। এখনও এই প্রশ্নগুলো সুস্থবুদ্ধির মানুষের বিবেককে নাড়া দেয় যে, ইসলাম কি শান্তির ধর্ম, না যুদ্ধের ? ইসলাম কি সন্ত্রাস, রক্তপাত, ধ্বংস ও অরাজকতা সমর্থন করে ? ইসলাম কি নিপীড়ন–নির্যাতন ও উৎখাতের কথা বলে ? ইসলাম কি ধর্মীয় মতভেদের কারণে––তা সে আভ্যন্তরীণই হোক আর অপর কোনো ধর্মের সঙ্গেই হোক–লুটতরাজ-অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও সন্ত্রাসের অনুমতি দেয় ? ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় 'মযহব কি নাম পর খুন'–এর পুনঃপ্রকাশের পূর্বে ঐশী আলোক বিকীর্ণকারী গ্রন্থকার পুস্তকটি আগা গোড়া রিভাইজ করেন, এর মধ্যে অনেক নতুন তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশিত করেন। বিশেষ করে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে –এর মধ্যে আরোও

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সংযোজিত করেন। এবং গ্রন্থটির নাম রাখেন `Murder in the Name of Allah' – 'আল্লাহ্‌র নামে নরহত্যা'।

বর্তমান বঙ্গানুবাদে সেই নতুন প্রবন্ধ তিনটি এবং এগুলোর সাথে বিন্যস্ত পুনর্লিখিত 'রহ্‌মতুল্লিল আলামীন' – প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলো। অনুবাদ দেখে দিয়েছেন শ্রদ্ধাভাজন মওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরব্বী। এ পুস্তক খানার প্রুফ দেখার কাজটি সম্পাদন করেছেন জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, তাছাড়া আরও যারা যেভাবে বইটি প্রকাশার্থে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আল্লাহ্‌তালা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

আল্লাহ্ চাইলে আমরা পুনর্লিখিত পূরো গ্রন্থটির বাংলা তরজমা প্রকাশ করবো। কেননা, ইসলামের প্রকৃত রূপ ও শিক্ষা বিস্তারে-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ত্রুটি-বিচ্যুতি গোচরীভূত হলে আগামীতে সংশোধন করা যাবে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার।

খাকসার
শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান
অনুবাদক

ঢাকা
১১.০৭.৯৫ ইং

সূচীপত্র

ইসলামে ধর্মত্যাগ

'সেই প্রত্যেক ব্যক্তির নাম আমার জন্যে লিখে নাও যে নিজেকে বলে সে মুসলমান।' (হাদীস)।

'ধর্মত্যাগ' (Apostasy)-এর যে ধারণা বা কন্‌সেপ্ট, যা মধ্যযুগীয় খৃষ্টধর্মের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল, যা মওলানা মওদুদী আবার পেশ করেছেন, তা ইস্‌লাম বহির্ভূত। এই ধারণাটি প্রকাশের জন্য আরবী ভাষায় একটিও শব্দ নেই। সন্দেহ নেই যে, প্রাথমিক যুগের কোন কোন মুসলিম আইন-বিশারদ মনে করতেন যে, ইসলাম পরিত্যাগ করা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। কিন্তু, তাদের দেওয়া 'মুসলমান'-এর সংজ্ঞা এত ব্যাপক ছিল যে, নিজেকে 'মুসলমান, বলে পরিচয়দানকারী কোন ব্যক্তিকেই ধর্মত্যাগকারী বলাই সম্ভব ছিল না। হযরত রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহোতা'লা আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে মুসলমানের দু'টো সংজ্ঞা দিয়ে গেছেনঃ মদীনার প্রথম আদম শুমারীর প্রাক্কালে রসূলে পাক (সাঃ) বলেছিলেন, 'সেই প্রত্যেক ব্যক্তির নাম আমার জন্যে লিখে নাও যে নিজেকে বলে সে মুসলমান,'[১]। তিনি (সাঃ) আর একবার অন্য এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ার ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের 'কিবলা'র দিকে মুখ করে, এবং আমাদের যবাই করা (পশু-পাখীর গোশ্‌ত) খায়, সে মুসলমান। সে আল্লাহ্‌র জিম্মায় এবং আল্লাহ্‌র রসূলের জিম্মায়। সুতরাং আল্লাহ্‌কে তাঁর জিম্মাদারিত্বে অপদস্থ করো না।'[২]

কিন্তু মওলানা মওদুদী এবং সেই সমস্ত আলেম, যাঁরা মুসলিম দেশগুলোতে একনায়কত্ব ও স্বৈরাচার সমর্থন করেন তাঁরা, নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত সহজ-সরল সংজ্ঞার উপরে আরো নানান বৈশিষ্ট্য বা শর্ত আরোপ করেছেন। আল্ গাজ্জালী (রহঃ) (হিঃ ৪৫০-৫০৫; খৃঃ ১০৫৮-১১১৩)-এর কথায়, তারা (আলেমরা), "আল্লাহ্‌র সীমাহীন রহমতের বেহেশ্‌ত্‌কে ধর্মবেত্তাগণের ঘোঁট পাকাবার জন্যে সংরক্ষিত করে ফেলেছে।"[৩] তাদের কার্যকলাপের একটা সার সংক্ষেপ পাওয়া যায়– পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ মুনীরের কথায়। তিনি পাঞ্জাব দাঙ্গার (১৯৫৩) তদন্ত আদালতেরও প্রধান ছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "আলেমগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞার কথা সামনে রেখে, আমরা আর কি বলতে পারি এই কথা ছাড়া যে, কোন দু'জন বিজ্ঞ আলেমই এই মৌলিক বিষয়ে একমত নন ? আমরাও যদি প্রত্যেক আলেমের মত আমাদের নিজস্ব একটা সংজ্ঞা দিতে যাই, এবং সেই সংজ্ঞাটা যদি অন্য সব আলেমের দেওয়া সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে ভিন্ন মত পোষণের দরুন আমরা ইসলাম থেকে

খারিজ হয়ে যাই। আর যদি আমরা যে কোন এক আলেমের সংজ্ঞা গ্রহণ করি, তাহলে তাঁর মতে তো আমরা মুসলমান থাকি বটে, কিন্তু অন্য সকলের মতে কাফের হয়ে যাই।'[৪]

বিচারপতি মুনীরের এই মন্তব্যকে অবশ্যই পাঠ করতে হবে হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর সেই কঠোর তিরস্কারের প্রেক্ষিতে, যা তিনি করেছেন উসামা বিন যায়েদকে। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, গালিব বিন আব্দুল্লাহ্ আল্ কালবীর অভিযানে উসামা বিন যায়েদ এবং তার সঙ্গীর দ্বারা এক ব্যক্তি নিহত হয়। এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে উসামা বিন যায়েদ বলেনঃ

> "যখন আমি ও একজন আনসার সেই ব্যক্তিকে পরাস্ত করি এবং আমাদের অস্ত্র দিয়ে তাকে আক্রমণ করি, তখন সেই ব্যক্তিটি 'কলেমা শাহাদাৎ' পাঠ করলো। কিন্তু, আমরা আমাদের হাতকে থামাইনি এবং তাকে হত্যা করে ফেলি। আমরা যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে ফিরে এলাম, এবং তাঁর কাছে ঘটনার বর্ণনা দিলাম, তখন তিনি (সাঃ) বললেনঃ 'ঈমান আনার ঘোষণাকে উপেক্ষা করার অপরাধ থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে, উসামা ?' আমি তাঁকে বললাম, লোকটা তো শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্যই ঈমানের কথাগুলি উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু, তিনি (সাঃ) তাঁর প্রশ্নটি আবারও করলেন এবং তা বারবার করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে আমার মনে হয়েছিল, হায় রে ! আমি যদি এই ঘটনার আগে মুসলমান না হতাম, এবং আমি যদি লোকটাকে হত্যা না করতাম। আমি তাঁর (সাঃ) কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম, "আমি আর কখনই কলেমা উচ্চারণকারী কোন ব্যক্তি হত্যা করবো না।" রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'ও কথা তুমি আমার পরে (মৃত্যুর পরে) বলিও, উসামা।' আমি বললাম, 'আমি তাই করবো'।"[৫]

হযরত রসূলে পাক (সাঃ) জানতেন যে, কলেমা শাহাদাৎ পাঠকারী মুসলমানদের জীবন সম্পর্কে তাঁর (সাঃ) উৎকণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও, তাদেরকে বিপথগামী লোকেরা ইসলামের নামেই হত্যা করবে। মসনদ ইমাম আহমদ হাম্বল-এর বর্ণনানুযায়ী, নবী করীম (সাঃ) উসামাকে এই প্রশ্নও করেছিলেন যে, সে কি ঐ নিহত ব্যক্তির হৃদয় চিরে দেখেছিল যে, সে সত্যিই সত্যিই ঈমান এনেছিল কি না ?[৬] কিন্তু, তবু তো ক্ষমতা লোভী ও রাজনৈতিক স্বার্থ প্রণোদিত আলেমরা অজ্ঞ মুসলমানদেরকে উস্কানী ও প্ররোচনা দিয়েই চলেছে তাদের সেই মুসলিম ভাইদেরকে হত্যা করার জন্য–যে মুসলিমদের সঙ্গে তাদের মতামতের

সামান্য কিছু মাত্র গরমিলও রয়েছে। মনে হয় যেন ঐ আলেমরা এই মুসলমানদের কলিজা ফেড়ে তার মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছে যে, তাদের ঈমান ছিল মিথ্যা।

স্বকীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ বা প্রত্যাহার করার ব্যাপারে পবিত্র কোরআন যে শব্দটি ব্যবহার করেছে তা হচ্ছে 'ইরতাদ্দা'–যার অর্থ–কোন মুসলমানকে মুরতাদ বলার অধিকার কারো নেই। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী[৭]-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, 'ইরতেদাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে–যে স্থান থেকে রওয়ানা দিয়েছিল সেই স্থানে ফিরে আসা। শব্দটি বিশেষভাবে সেইভাবে ধর্মত্যাগ করার অর্থাৎ ইসলাম থেকে কুফরীতে (অবিশ্বাসে) প্রত্যাবর্তন করার–সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন,–"যারা নিজেদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায়, তাদের উপর হেদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর........."। (মুহাম্মদ - ৪৭ঃ২৬) এবং

"...তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের দীন (ধর্ম) থেকে ফিরে যাবে....."। (আল্ মায়েদা – ৫ঃ৫৫)

পবিত্র কোরআনে 'রিদ্দা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অকর্মক রূপে ('ইফ্তিয়াল'-এর ওজনে), যার অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেকেরই পসন্দ অপসন্দের অধিকার আছে, কিন্তু কারও এই অধিকার নেই যে, সে অপর কাউকে 'মুরতাদ' বলে। এটা একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ, এবং এতে বাইরের কারও কোন ভূমিকা পালন করার কিছু নেই। এটাই স্বাধীন ইচ্ছার সেই বৈশিষ্ট্য যা 'ইরতিদাদ'কে আলাদা করেছে খৃষ্ট ধর্মের ও মওদুদীর ধর্মত্যাগের ধারণা (Concept of apostasy) থেকে ।.....। ধর্মত্যাগ (Apostasy) এবং এর শাস্তির জন্য প্রয়োজন একটি বাইরের কর্তৃপক্ষের–সেই কর্তৃপক্ষ চার্চও হতে পারে, রাষ্ট্রও হতে পারে। এটা ফাঁসি কিংবা, বরং, খুন-এর মত ব্যাপার। 'ইরতেদাদ' আত্মহত্যার মত। কেউ কাউকে ফাঁসি দিতে পারে কিংবা খুন করতে পারে। কিন্তু, কেউ কাউকে 'আত্মহত্যা' করতে পারে না।

'সূরা আল্ কাফেরুন' নাযিল হয়েছিল নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রথম পর্যায়ে। এই সূরাটি (অধ্যায়টি) বিবেকের স্বাধীনতার বিষয় সংক্রান্ত নীতির একটি প্রত্যেক্ষ বিবরণ। রসূলে পাক (সাঃ)–কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল অবিশ্বাসীদেরকে এই কথা বলতে যে, তাঁর (সাঃ) এবং তাদের জীবনধারার মধ্যে আদৌ কোনও মিলন-বিন্দু নেই। যেহেতু, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রকারের কোন মিল নেই – না ধর্মের কোন মৌলিক বিষয়ে, না তার খুঁটি–নাটি ও অন্যান্য বিষয়ে – সেহেতু, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রকার আপোষের কোন সাম্ভাব্য

সুযোগও নেই। অতএব, "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।" (১০৯ঃ৭)

হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-কে বারবার বলা হয়েছে যে, তাঁর বাণী যদি অবিশ্বাসীরা গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তজ্জন্য তিনি যেন উদ্বিগ্ন না হন। তিনি তো তাদের কোন ওয়াকিল বা অভিভাবক নন। আল্লাহ্‌তা'লা বলেনঃ "তোমার জাতি একে (এই বাণীকে–যা আমরা তোমার মাধ্যমে পাঠিয়েছি) মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ ইহাই সত্য; তুমি বল, 'আমি তোমাদের উপর কোন ওয়াকিল নই।'[৮] (আল্ আন্-আম – ৬ঃ৬৭) এই সত্যের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল রসূলে পাক (সাঃ)-এর মক্কী জীবনে, যখন তিনি এবং সাহাবীগণ (রাঃ) নির্যাতিত অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু মদীনায় আসার পরেও, এই ঘোষণা একই ছিল, যদিও এখানে তিনি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বরং তা আরও সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছিল।

প্রথম মদনী সূরা (অধ্যায়), যার মধ্যে বিবেকের স্বাধীনতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে, তার নাম 'আল্-বাকারাহ্'। এই সূরার ২৫৭ নং আয়াতে বিষয়টি উচ্চারিত হয়েছে অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে ঃ

> "ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই। (কেননা) সৎপথ ও ভ্রান্তি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মজবুত করে ধরেছে যা কখনও ভাঙ্গবার নয়। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।" (২ঃ২৫৭)

এটাই ছিল একজন নবীর আস্থাপূর্ণ অটল ঘোষণা, যিনি একটি জাতি (উম্মাহ্) গঠন করেছিলেন এমন একটি শহরে, যে শহরে তাঁর ক্ষমতাই ছিল সুপ্রীম – সবার উর্ধ্বে। 'জেহাদ'–এর বিষয়টিকে পাছে ভুল বোঝা হয় সেজন্য মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত পুণ্য নিহিত সৎকাজ ও সরল বিশ্বাসের মধ্যে। (দ্রঃ ২ঃ২৫৫-২৫৮) এবং আল্লাহ্‌তা'লার মর্যাদা ও মহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে আয়াত–আল্ কুরসীতে (২ঃ২৫৬)। "ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই' – এই আদেশ এসেছে আয়াত-আল্ কুরসীর পরেই। কোরআন করীমের পাঠকরা একথা মনে করতে পারে যে, আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে বল প্রয়োগে ইসলামের প্রচার ও প্রসার করতে বলেছেন। কেননা, এতে 'উম্মাহ্'র শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সমীপে বিশেষভাবে

আত্মত্যাগ বা কোরবানী করতে বলা হয়েছে। সুতরাং, এই আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা যেন ধর্মান্তরিত করার নামে কোন প্রকার জোর–জবরদস্তির পন্থা অবলম্বন না করে। এই আয়াতের গুরুত্ব অনুমান করা যেতে পারে একটি হাদীস থেকেও (জামী ঃ তিরমিযী)। আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন যে, আল্ কোরআনের চূড়া হচ্ছে আল্–বাকারা, এবং শয়তান সেই ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না, যে এই সূরার দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে (অর্থাৎ, প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুরসী এবং এর পরবর্তী দুই আয়াত –২৫৭, ২৫৮ – ,এবং শেষ তিন আয়াত।

বল প্রয়োগ না করার নীতি পুনরায় উল্লেখিত হয়েছে 'বদর' যুদ্ধের জয়ের পর (৩ঃ২১), এবং আবারও সূরা মায়েদায় – যা কিনা সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। এখন তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কর্তৃত্ব শুধু মদীনাতেই নয় মক্কাতেও পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই, এখন এই কথার উপরে জোর দেওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) কাজ শুধু এতটুকুই যে, তিনি মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেবেনঃ 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং তাঁর এই রসূলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, আমাদের রসূলের উপর দায়িত্ব শুধুমাত্র স্পস্টভাবে (পয়গাম ঃ বাণী) পৌঁছিয়ে দেওয়া।' (আল্ মায়েদা – ৫ঃ৯৩) এবং সবশেষেঃ 'এই রসূলের উপর দায়িত্ব কেবল (পয়গাম) পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহ্ অবগত আছেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।' (৫ঃ১০০)। ধর্মীয় বিশ্বাস একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন – না কোন রাষ্ট্র জানে, না কোন কর্তৃপক্ষ – যে, মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে কি প্রকাশ করে, আর কি গোপন করে।

এই আয়াতের পরেই শুরু হয়েছে 'মুনাফেকদের' (কপট বিশ্বাসীদের) বিষয়টি। 'মুনাফেকূন' শব্দটির দ্বারা মদীনার সেই সকল বাসিন্দাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা বাহ্যিকভাবে তো ইসলাম গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু তাদের ঈমান নানা কারণে সন্দেহজনক ছিল। কোরআন করীমে তাদের উল্লেখ এসেছে বহুবার, কিন্তু চারটি আয়াতে (পরিচ্ছেদে) তাদেরকে বলা হয়েছে 'মুরতাদ' (ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগকারী)। প্রথম উল্লেখ এসেছে ' সূরা মুহাম্মদ'–এ। এটি একটি মদনী সূরা (মদীনায় অবতীর্ণ সূরা)। এতে সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, মুমিনরা যখন আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধের আহ্‌বান সম্বলিত কোন 'ওহী'কে (ঐশীবাণীকে) সানন্দে বরণ করে নেয়, তখন মুনাফেকরা

মনে করে যে, এখন তাদেরকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে। এই উপায়ে, প্রকৃত মুমিনদেরকে পৃথক করা হতো তাদের থেকে যাদের ঈমান ছিল ভাসাভাসা কিংবা ঝুটা। বলা হয়েছেঃ

> "যারা নিজেদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায়, তাদের উপর হেদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর, নিশ্চয় শয়তান তদেরকে বিপথে প্রলুব্ধ করে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। এটা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যা নাযেল করেছেন তাকে যারা ঘৃণা করে তাদেরকে এরা বলে, আমরা কোন কোন বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের আনুগত্য করবো, এবং আল্লাহ্ তাদের সকল রহস্য জানেন।" (সূরা মুহাম্মদ – ৪৭ঃ২৬, ২৭)

উদ্ধৃত এই আয়াতগুলিতে এই লোকগুলোকে শাস্তি দানের কোন কথার উল্লেখ নেই।

মুনাফেকদের সম্পর্কে পরবর্তী উল্লেখ এসেছে 'সূরা আল্ মুনাফেকূন'–এ। এই সূরাটি নাযেল হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর (৬২৮ খৃঃ) শেষের দিকে। এই সূরাটি মুনাফেকদের ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস ও অসাধুতা ফাঁস করে দিয়েছে। এবং তাদের বাহ্যিকভাবে ঘোষিত ঈমানকে ঝুটা ও প্রতারণাপূর্ণ বলে নিন্দা করেছে। এটা ছিল এক প্রকাশ্য তিরস্কারঃ

> ....আল্লাহ্ এই সাক্ষ্যও দিচ্ছেন যে, মুনাফেকরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের কসমকে ঢালরূপে অবলম্বন করে, এ ভাবেই তারা (লোকদেরকে) আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত করে। নিশ্চয় তারা যা করছে তা অতিশয় মন্দ। এটা এজন্যই যে, তারা (প্রথমে) ঈমান এনেছিল; অতঃপর তারা অস্বীকার করলো। ফলতঃ, তাদের অন্তঃকরণসমূহের উপর মোহর মেরে দেওয়া হলো, অতএব তারা কিছুই বুঝতে পারছে না। ....তারাই শত্রু, সুতরাং তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও।.................তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর, তাদের জন্য উভয়ই সমান, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।" (আল্ মুনাফেকূন–৬৩ঃ২-৭)

মুনাফেকদের সম্পর্কে শেষে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তা বিধৃত আছে শেষের দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলির একটিতেঃ সূরা আত্ তাওবা'–তেঃ

"তোমরা কোন ওজর পেশ করো না। তোমরা অবশ্যই তোমাদের ঈমানের পর কুফরী করেছ। যদি আমরা তোমাদের একদলকে ক্ষমা করে দেই, তাহলে অপর একদলকে শাস্তি দেব এই জন্য যে, তারা অপরাধী।" (৯ঃ৬৬)

যাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তারা স্পষ্টতঃই ঐ সকল মুনাফেক যারা তওবা করেছে, অনুতাপ করেছে এবং আন্তরিকভাবেই মুসলমান হয়েছে। এবং যাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাদের সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি এক আয়াত পরেইঃ

"আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী এবং কাফেরদেরকে জাহান্নামের আগুনের –যেখানে তারা বসবাস করতে থাকবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। .....এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।" (৯ঃ৬৮)

এবং অবশেষে, –

"তারা আল্লাহ্র নাম নিয়ে শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি, অথচ তারা অবশ্যই অবিশ্বাসের কথা বলেছে, এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর অবিশ্বাস করেছে।

.........সুতরাং তারা যদি তওবা করে, তাহলে তাদের জন্য ভাল হবে, কিন্তু যদি তারা ফিরে যায়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন--এই দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। এবং এই দুনিয়াতে তাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী থাকবে না।" (৯ঃ৭৪) ৯

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) জানতেন যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল ছিল মুনাফেকদের নেতা, কিন্তু তিনি (সাঃ) তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। পক্ষান্তরে, সে মারা গেলে নবী করীম (সাঃ) তার জন্য জানাযার নামায আদায় করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর বিন আল্ খাত্তাব (রাঃ) বলেছেনঃ

"যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গেলেন এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর মৃতদেহের পাশে দাঁড়াইলেন এবং তার জন্য দোয়া করতে উদ্যত হলেন, তখন আমি তাঁকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলাম,'আপনি কি আল্লাহ্র শত্রুর জন্যে প্রার্থনা করতে যাচ্ছেন ?' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৃদু হাসলেন এবং বললেন, 'উমর আমার পিছনে সরে এসো। আমাকে পসন্দ-অপসন্দের একটা অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং আমি এটাই পসন্দ

> করেছি। আমাকে বলা হয়েছিল, 'তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেও পার, না-ও পার। তুমি যদি তাদের জন্য সত্তুর বারও ক্ষমা চাও, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আমি যদি জানতে পারি যে, সত্তুর বারের বেশী প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তাহলে আমি তা-ই করবো।' অতঃপর, তিনি তার জন্য দোয়া করলেন তার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে এবং লাশ দাফন না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন।"[১০]

'ধর্মের ব্যাপারে বল প্রয়োগ নেই' –এই নীতির অগ্নি-পরীক্ষা হচ্ছে ধর্মান্তরণের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা কখনই একমুখী (ওয়ান–ওয়ে) হতে পারে না, –এটা হতে পারে না যে, ইসলামে শুধু প্রবেশেরই স্বাধীনতা আছে, বেরুবার স্বাধীনতা নেই। ধর্ম পরিত্যাগ করার সরাসরি উল্লেখ আছে কোরআন শরীফে দশবারঃ একবার আছে মক্কী সূরা (মক্কায় অবতীর্ণ সূরা – অধ্যায়) 'আন্ নহলে' এবং বাকী ন'বার আছে মদনী (মদীনায় অবতীর্ণ) সূরাগুলিতে। কিন্তু এই সমস্ত আয়াতগুলির কোন একটিতেও একথা বলা নেই যে, ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

ধর্মত্যাগ সম্পর্কে কোরআন করীমের একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা হচ্ছে সূরা আল্ বাকারার ১৪৩ নং আয়াতটি। হিজরীর দ্বিতীয় বর্ষে 'ক্বিবলা' পরিবর্তন করা হয়েছিল জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে। ইব্‌নে ইসহাক বর্ণনা দিচ্ছেনঃ

> " যখন সিরিয়ার পরিবর্তে 'কাবা' অভিমুখে 'ক্বিবলা' ঠিক করা হলো, তখন রিফা বিন কায়েস, কারদাম বিন আমর, কাব বিন আল্ আশরাফ, রকিব আবু রফী, আল্ হাজ্জাব বিন আমর, এবং কাবের একজন মিত্র, আল্-রাবি বিন আল–রাবি বিন আবুল হুকায়েক, এবং কিনানা বিন আল্-রাবি বিন আল্-হুকায়েক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর নিকটে এলো এবং জিজ্ঞেস করলোঃ আপনি কেন ক্বিবলার প্রতি পিঠ ফেরালেন যার দিকে মুখ করে আপনি দাঁড়াতেন যখন আপনি দাবী করতেন যে, আপনি ইব্রাহীমের ধর্মের অনুকরণ করেন ? যদি আপনি জেরুজালেমের ক্বিবলার দিকে মুখ ফেরান, তাহলে আমরা আপনার অনুসরণ করবো এবং ঘোষণা দিব যে, আপনি সত্য'। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (সাঃ) তাঁর ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা। সুতরাং, আল্লাহ্ বললেন, 'এবং ঐ ক্বিবলাকে যার উপর তুমি (ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিলে, আমরা শুধু এজন্যই নির্ধারণ করেছিলাম যেন এই রসূলের যে অনুসরণ করে তাকে ঐ সকল লোক থেকে (স্বতন্ত্ররূপে) জেনে নিই যারা নিজেদের

গোড়ালিতে (উল্টোমুখে) ফিরে যায়। এবং যাদেরকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের জন্য এ অবশ্যই কঠিন (পরীক্ষা)।"১১

এই সকল ধর্মত্যাগের জন্যেও কোন শাস্তির ব্যবস্থা দেয়নি পবিত্র কোরআন। এবং ইতিহাসেও এমন কোন বিবরণ নেই যে, ক্বিবলা পরিবর্তনের কারণে যারা ধর্মত্যাগ করেছিল তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

'সূরা আলে-ইমরান' নাযেল হয়েছিল বদর যুদ্ধের (হিঃ০২ / খৃঃ ৬২৪) বিজয়ের পরে। এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াত দু'টিতে মদীনার কতিপয় ইহুদীর ধর্মত্যাগের কথা বলা হয়েছেঃ

> "হে আহ্লে কিতাব (গ্রন্থের অনুসারীবৃন্দ)! কেন তোমরা জেনে, বুঝে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং সত্যকে গোপন কর ? আহ্লে কিতাবের মধ্য থেকে একদল বলে, 'ঈমান এনেছে যারা তাদের উপর যা কিছু নাযেল করা হয়েছে, তার উপর তোমরা দিবসের প্রথম ভাগে ঈমান আন এবং তার শেষভাগে অস্বীকার কর, যেন তারা ফিরে আসে।" (৩ঃ৭২, ৭৩)

এই চক্রান্তের পরিকল্পনা যারা করেছিল তাদের নামও উল্লেখ করেছেন ইব্নে ইসহাক ঃ

> আব্দুল্লাহ্ বিন সাইফ, আদিঈ বিন যায়েদ এবং আল্ হারিস বিন আউফ রাজী হয়েছিল এই ভান করতে যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সাহাবীদের (রাঃ) বাণীর উপরে একবার ঈমান আনবে এবং আর একবার তা পরিত্যাগ করবে, এবং এর দ্বারা তারা তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, তাঁরাও তাদের অনুসরণ করবে এবং তাঁদের ধর্ম ছেড়ে দেবে।১২

এই ইহুদী তিনজনের কাউকেই শাস্তি দেওয়া হয়নি। আরও একটি ঘটনার উল্লেখ আছে 'সূরা আন্ নিসা'তে। এতে বলা হয়েছেঃ

> "নিশ্চয় যারা ঈমান আনে অতঃপর, অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে, অতঃপর অস্বীকার করে, এবং তারা অস্বীকারে বেড়ে যায়, আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করবেন না।" (৪ঃ১৩৮)

কোন ধর্মত্যাগী কখনই বার বার ধর্মত্যাগের এই বিলাসিতায় লিপ্ত হতে পারতো না, যদি তার শাস্তি হতো মৃত্যুদণ্ড।

'সুন্নাহ' [হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর ঐশী প্রেরণা লব্ধ চারিত্র্য ও কার্যাবলী) হচ্ছে 'শারীয়াহ্' -এর দ্বিতীয় উৎস। এই সুন্নাহ্র মধ্যেও এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যে, ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে কোন শাস্তি দান করা হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) যাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন তাদের নাম লিখিত আছে 'সীরাতে' (রসূলে করীম-সাঃ-এর জীবনী গ্রন্থে) এবং 'হাদীসে'। এবং যারা তাঁর (সাঃ) জীবদ্দশায় ইসলাম পরিত্যাগ করেছিল এবং তাদের এই ধর্মত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিল তাদেরও নাম লিখিত আছে ইতিহাসে। এক আরব বেদুঈন ইসলাম কবুল করেছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাতে। এবং এর পরে পরেই সে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখনও সে মদীনাতেই ছিল। সে রসূলে করীম (সাঃ)-কে অনুরোধ করলো তাকে বয়াতের অঙ্গীকার থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য। সে তিনবার অনুরোধ করে, কিন্তু তিন বারই তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। সে নির্বিঘ্নে ও নির্বিবাদে মদীনা ছেড়ে চলে যায়। নবী করীম (সাঃ) তার চলে যাওয়ার কথা শুনে বলেছিলেনঃ মদীনা এমন একটি অগ্নিকুণ্ডের মত যা খাঁটি জিনিস থেকে খাদ বের করে ফেলে।'[১৩]

ইব্নে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কা প্রবেশের সময় তাঁর সেনানায়কদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন কেবল বাধাদানকারীদের সঙ্গেই যুদ্ধ করেন। ব্যতিক্রম ছিল কেবল নিম্নে উল্লেখিত কয়েকজন অপরাধী, এরা যদি কাবার পর্দার আড়ালেও লুকিয়ে থাকে তবু এদের বিরুদ্ধে হত্যার নির্দেশ ছিল।[১৪] এরা হলোঃ

১. আব্দুল্লাহ্ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্

২, ৩, ৪. - বনু তায়াম বিন গালিব এর আব্দুল্লাহ্ বিন খাতাল এবং তার দু'জন নর্তকী বালিকা, -এর ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রুপাত্মক গান গাইতো,- এদের এজনের নাম ফরতানা, আর এজনের নামের উল্লেখ করেন নি ইব্নে ইসহাক।

৫. আল্ হুয়ারিস বিন নুকাইদ বিন ওয়াহাব বিন আবদ্ বিন কুসাঈ,

৬. মাকীস বিন সুবাবাহ্

৭. সারাহ্ - বনু আব্দুল মুত্তালিবদের এক ব্যক্তির মুক্ত ক্রীতদাস,

৮. ইকরামা বিন আবু জাহল।[১৫]

১. আব্দুল্লাহ্ বিন সাদ ছিল মদীনায় রসূলে পাক (সাঃ)–এর অন্যতম কেরানী। সে ধর্মত্যাগের ঘোষণা দেয় এবং মক্কার কাফিরদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক প্রাপ্ত 'ওহী' (ঐশীবাণী) – তাঁর (সাঃ) ডিকটেশন (নির্দেশ) মত লিখে রাখতো। কাজেই, সে ছিল একজন আমানতদারের মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তার মত এক ব্যক্তির স্বপক্ষ ত্যাগ মক্কার কোরেশদের মধ্যে 'ওহী'র প্রামাণিকতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে বাধ্য। মক্কায়, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে পর তার দুধ-ভাই উসমান বিন আফ্‌ফান, তার পক্ষে রসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে সুপারিশ করেন, এবং তাকে ক্ষমা করা হয়।[১৬] ধর্মত্যাগের জন্য যদি কোন কোরআনী শাস্তির বিধান থেকেই থাকতো, তাহলে আঁ হযরত (সাঃ) তাকে ক্ষমা করতেন না। পক্ষান্তরে, 'হদ্দ' (সীমাঃ এমন অপরাধ যেজন্য নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান আছে কোরআনী আইনেঃ বহু বচনে 'হুদুদ') –এর শাস্তির ক্ষেত্রে সুপারিশের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নীতি ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একবার একজন মখজুমী স্ত্রীলোক চুরির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়। তার পক্ষে উসামা বিন যায়েদ সুপারিশ করেন। উসামাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তিরস্কার করেন এবং বলেন; 'তুমি কি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? মনে রেখো, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে নিশ্চয় আমি তার হাত কেটে ফেলবো।'

হযরত নবী করীম (সাঃ) আব্দুল্লাহ্ বিন খাতালকে 'যাকাত' আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তার সঙ্গে খাদেম হিসেবে গিয়েছিলেন একজন 'আনসার' (মদীনাবাসী মুসলমান)। তারা একস্থানে থামলেন, এবং সে তার সঙ্গীকে একটা ছাগল যবাই করে খানা প্রস্তুত করতে বলে ঘুমাতে গেল। ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পেল, লোকটা কিছুই করেনি। তখন সে রেগে যায় এবং তার সঙ্গীটিকে খুন করে ফেলে। অতঃপর সে ধর্মত্যাগের ঘোষণা দেয় এবং মক্কায় গিয়ে কোরেশদের সঙ্গে যোগ দেয়।[১৭]

একজন মুসলমান আনসারকে হত্যা করার অপরাধে আব্দুল্লাহ বিন্ খাতালকে হত্যা করেন সাঈদ বিন হুরাইস আল্–মাখ্‌জুমী এবং আবু বরয্ আল্–আসলামী।[১৮]

ইব্‌নে খাতালের দুজন গায়িকা নর্তকীর একজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় শ্লেষাত্মক গান গেয়ে অস্থিরতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টির অপরাধে, অপরজনকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।১৯

আল্‌-হুয়ারিস বিন নুকাইদ ছিল হাব্বার বিন আল আসওয়াদ বিন আল্‌ মুত্তালিব বিন্‌ আশাদ-এর দলভুক্ত। তারা মদীনার পথে হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কন্যা যয়নব (রাঃ)-এর নাগাল ধরে ফেলে। যয়নব মক্কা থেকে মদীনায় যাচ্ছিলেন। আল্‌ হুয়ারিস যয়নাবের উটকে প্রচণ্ড আঘাত করে তাড়া করে। যয়নাব ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। এই আক্রমণের ফলে তার গর্ভপাত ঘটে, এবং তাঁকে মক্কায় ফিরে আসতে হয়। নবী করীম (সাঃ) কয়েকজন লোককে পাঠিয়ে দেন এই আদেশ দিয়ে যে, তারা যদি হাব্বার এবং আল্‌ হুয়ারিসকে পায় তাহলে যেন তাদেরকে হত্যা করে।২০ কিন্তু আল্‌ হুয়ারিস পালিয়ে বাঁচে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হিশাম বলছেন যে, আল্‌ আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর দুই মেয়ে হযরত ফাতেমা ও হযরত উম্মে কুলসুম (সাঃ)-কে উটের পিঠে করে মক্কা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা করে দেন। আল্‌ হুয়ারিস তাঁদের উটকে এত প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে যে, উটটি তাঁদেরকে মাটিতে ফেলে দেয়।২১ পরে, হযরত আলী (রাঃ) তাকে মক্কাতে হত্যা করেন।২২

মাকীস বিন সুবাবাহ্‌ মক্কা থেকে মদীনায় আসে এবং বলেঃ 'আমি একজন মুসলমান। আমি আপনাদের কাছে এসেছি ভ্রাতৃ-হত্যার ক্ষতিপূরণ চাইতে, আমার ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে।' নবী করীম (সাঃ) আদেশ দিলেন যে, তার ভাই হিশামের হত্যার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে মাকীস সেখানে নবী করীম (সাঃ)–এর কাছে কিছুক্ষণ থাকে। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে ভাইয়ের হত্যাকারীকে নিহত করে, এবং ধর্মত্যাগের ঘোষণা দেয় এবং মক্কায় পালিয়ে আসে।২৩ পরে মাকীসকে হত্যা করেন নুমায়লা বিন আব্দুল্লাহ্‌, কেননা, সে তার ভ্রাতৃ-হত্যার ক্ষতিপূরণ পাওয়া সত্ত্বেও, একজন আনসারকে হত্যা করেছিল।২৪

সারাহ্‌ ছিল অরাজকতা সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত। কিন্তু, তাকে রসূলে পাক (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় হত্যা করা হয়নি।

ইকরামা বিন আবূ জাহল ইয়েমেনে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী উম্মে হাকিম মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন রসূলে পাক (সাঃ)।২৫

এমন কোন ঘটনা নেই যদ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, রসূলে পাক (সাঃ) ধর্মত্যাগ করার জন্য মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর (হিঃ ১১/খৃঃ ৬৩২) তরুণ মুসলিম প্রশাসন গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। গোটা জজিরাতুল আরবের বহু এলাকায় বিশৃংখলা দেখা দেয়, এবং বহু গোত্র 'যাকাত' দিতে অস্বীকার করে মদীনা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নেয়। এই আন্দোলনকে বলা হয় 'আল্–রিদ্দা'। নবী করীম (সাঃ)-এর প্রথম খলীফা আবূ বকর (রাঃ)–এর প্রধান কর্তব্য ছিল তখন সেনাবাহিনীকে সেই অভিযানে প্রেরণ করা, যার হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর জীবিতকালে। অতএব, হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের দ্বিতীয় দিবসেই উসামা বিন যায়েদ বিন হারিস-এর সেনানায়কত্বে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন সিরিয়ার সীমান্তে।

উসামা এবং তাঁর সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার পর, প্রায় সকল গোত্রই মদীনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেবল মক্কা, মদীনা এবং তাদের আশে পাশের অধিবাসীরা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রতি অনুগত থাকে। যে সকল মুসলিম কর্মকর্তাকে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর ইন্তেকালের ঠিক পূর্বে নিয়োগ করেছিলেন বিদ্রোহী গোত্রগুলোতে, তাঁদেরকে তাদের পদ ও কর্মস্থল ছাড়তে বাধ্য করা হয় এবং তাঁরা মদীনায় ফিরে আসেন। এটা ছিল এক সর্বাত্মক বিদ্রোহ।

বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আবূ বকর (রাঃ) অনুগত গোত্রগুলোর কাছে দূত পাঠালেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। আবূ বকর (রাঃ) যখন সেনাবাহিনী সংগঠনের অপেক্ষায় ছিলেন তখন আকস্মিকভাবে মদীনার উপরে হামলা চালায় খারজাহ্ বিন হিসম, এবং এই হামলায় নেতৃত্ব দেয় উনায়নাহ্ বিন হিসম আল্–ফাজারী এবং আল্-আকরা বিন হবিস আল্–তামিমি। মুসলমানরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে প্রথমে পালিয়ে যায়; কিন্তু তারা পুনরায় একত্রিত হয় এবং খারজাহ্ বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং তাদেরকে পরাজিত করে।

জুআল–কাস্সায় সীমান্ত–সংঘর্ষের পূর্বে, আরব গোত্রগুলোর একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় এসেছিল 'যাকাত'-এর ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে আলোচনা করতে। কিন্তু, আবূ বকর (রাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি (রাঃ) যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেন, কিন্তু কয়েকজন প্রথম দিককার প্রখ্যাত 'মুহাজেরীন', তাঁর সঙ্গে একমত হলেন না। আলোচনার জন্য উদ্‌গ্রীব এই গোত্রগুলো এটা দেখাচ্ছিল ঠিকই যে, না তারা ধর্মত্যাগ করেছে, না তারা মদীনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। কিন্তু তবু, তারা তাদের উপরে মদীনার নিয়ন্ত্রণ মানতে রাজী ছিল না। ইস্যুটা আল্লাহ্ রসূলের ও রসূলের প্রতি ঈমানের ইস্যু ছিল না, ছিল যাকাতের। হযরত উমরের (রাঃ) নেতুত্বে নামকরা সাহাবীদের একটি দল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকরের (রাঃ) যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তে আপত্তি তোলেন। বর্ণিত আছে যে, উমর (রাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ এই সব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কি অধিকার আছে আপনার ? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো বলেছেন, 'আমি লোকদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট যতক্ষণ না তারা বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'– (আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই)। যদি তারা তা বলে, তাহলে তাদের জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদে থাকবে।২৬

প্রতিনিধি দলটি মদীনা থেকে চলে গেলে পর আবূ বকর (রাঃ) মদীনার মসুলমানদের এক সমাবেশ করেন এবং তাদের সামনে প্রদত্ত ভাষণে বলেনঃ

> 'প্রতিনিধি দলটি দেখে গেছে যে, তোমাদের কত স্বল্প সংখ্যক লোক এখন মদীনায় আছে। তোমরা জান না যে, তারা তোমাদের উপরে দিনে না রাতে হামলা করে বসবে। তাদের অগ্রবর্তী দলটি এখন মদীনার অতি নিকটেই অবস্থান করছে। তারা চেয়েছিল যে, আমরা তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করি এবং তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করি। কিন্তু, আমরা তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। সুতরাং,তাদের হামলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও'।

এর তিন দিনের মধ্যেই তারা মদীনার উপরে আক্রমণ চালায়।২৭

রিদ্দার যুদ্ধে বহু রক্তপাত হয়। আরব রাষ্ট্রের পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের কাছে এটা বোধগম্য ছিল না যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পরে পরেই আরব যমীনে এতগুলো যুদ্ধের প্রয়োজন পড়েছিল কেন। তাঁরা এজন্য দায়ী করেছেন 'রিদ্দা'কেই।২৮ 'রিদ্দা' ছিল তাঁদের ধারণামতে ইসলামের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় আন্দোলন। আইন-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা – যারা 'কুফরী' অথবা প্রতিপক্ষ মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে কোন মুসলমানকে প্রাণদণ্ড দান করার পক্ষে কোন কোরআনী অথবা সুন্নাহ্‌র কোন নির্দেশ খুঁজে পাননি, তাঁরাও আর চিন্তা-ভাবনা না করেই মুখ বুজে এই ধারণাটাকেই কবুল করে নিয়েছেন।

মুসলিম বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আবূ বকর (রাঃ)-এর যুদ্ধের বৈধতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম আল্-শাফী'ই বলেছেনঃ 'রিদ্দা' -হচ্ছে পূর্বে গৃহীত ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অবিশ্বাসের প্রতি ধাবিত হওয়া এবং পূর্বের ওয়াদা অনুযায়ী দায়িত্বাবলী পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা।২৯ ধর্ম পরিত্যাগ করাই যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ। ইবনে অবি আল্-হাদীদ ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শের একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি তাঁর 'নাহজ্ আল্-বালাগাহ্ -তফ্সীর গ্রন্থে বিষয়টা পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "যে গোত্রগুলো যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তারা ধর্মত্যাগী ছিল না। তাদেরকে তা বলতেন রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীরা রূপকভাবে" ।৩০

ওয়েলহৌসেন (Wellhausen)-এর মতে, -'রিদ্দ' -ছিল মদীনার নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, ইসলামের সঙ্গে নয়। প্রায় সব গোত্রই আল্লাহ্র এবাদত করে যাচ্ছিল এবং তা চালিয়ে যেতেই চাচ্ছিল। কিন্তু, তারা যাকাত দিতে চাচ্ছিল না। কিতানী (Caetani) ওয়েলহৌসেনের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন এবং বলেছেন যে, 'রিদ্দা' ধর্মত্যাগের কোন আন্দোলন ছিল না, এবং এই যুদ্ধগুলো ছিল স্রেফ, রাজনৈতিক। বেকার (Becker) ওয়েলহৌসেন এবং কিতানীর অনুসরণে উপসংহার টেনেছেন এভাবেঃ

> 'মাহোমেত (মুহাম্মদ -সাঃ)-এর আকস্মিক মৃত্যুতে কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলো নতুন করে সহায়তা পেলো। গোটা আন্দোলনের চরিত্র, যা এতদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল, তা ঐতিহাসিকদের নযরে ধরা পড়লো। আরব খন্ড খন্ড হয়ে যেতো, যদি না আল্-রিদ্দার বিচ্ছিন্নতার কারণে মদীনার রাষ্ট্রের মধ্যে এই শক্তির উদ্ভব ঘটতো, যা সব কিছুতেই সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। রিদ্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল না। আপত্তি স্বয়ং ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল মদীনাকে দেয় ট্যাক্স এর বিরুদ্ধে। যুদ্ধ ছিল আরবের রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জনের জন্য।৩১

বার্নার্ড লেউইস (Bernerd Lewis) এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, রিদ্দা 'ঘটনাবলীর প্রকৃত তাৎপর্যের একটা বিকৃত ধারণা পেশ করেছে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের ধর্মতাত্ত্বিক রঙিন দৃষ্টিভঙ্গী।' তিনি আরও বলেছেন ঃ

> গোত্রগুলো কর্তৃক আবূ বকরের (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারটা, কার্যতঃ, ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়া

লোকদের পূর্বধর্মে পৌত্তলিকতায় ফিরে যাওয়া ছিল না; বরং এটা ছিল, একপক্ষের মৃত্যুজনিত কারণে রাজনৈতিক চুক্তির এক প্রকার সরল ও স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি। মদীনার আশেপাশের গোত্রগুলো সত্যিকার অর্থেই ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিল, এবং তাদের স্বার্থ 'উম্মাহ্'-এর স্বার্থের সঙ্গে এত বেশী ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের আলাদা কোন ইতিহাসই লিপিবদ্ধ হয়নি। অন্যান্যদের বেলায়, মুহাম্মদের (সাঃ) মৃত্যুতে মদীনার সঙ্গে বন্ধন আপ্‌সে আপ ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এবং এই গোত্রগুলো তাদের স্বাধীন কার্যক্রম পুনরায় শুরু করে দেয়। তারা নিজেদেরকেকে কোনভাবেই আবূ বকরের (রাঃ) নির্বাচন মানতে বাধ্য বলে মনে করতো না, কেননা, তারা এই নির্বাচনে কোন অংশ গ্রহণ করেনি। কাজেই, তারা তৎক্ষণাৎ ট্যাক্স-প্রদান ও চুক্তির শর্ত পালন বন্ধ করে দিল। মদীনার প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনঃস্থাপন করত তাই, আবূ বকরকে (রাঃ) নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছিল।[৩২]

হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হন ৬৬১ খৃষ্টাব্দে। তাঁর (রাঃ) সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় সেই কনসেপ্ট বা ধারণাও, যে ধারণা অনুযায়ী একজন মুসলিম শাসক একই সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধান ও ধর্ম প্রধানের দায়িত্বাবলী পালন করতেন। উমাইয়াদের রাজ বংশীয় শাসন (৬৬১–৭৫০ খৃঃ) –ইসলামের রাজনৈতিক নরপতিদের সূচনা হয় মুয়াবিয়াকে দিয়ে। এই নরপতিদের কারুরই ধর্ম-প্রাণ খলীফাদের ন্যায় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না; এবং তাঁদেরকে কমবেশী ধর্মনিরপেক্ষ (সেক্যুলার) রাজা বলেই গণ্য করা হতো। কাজেই আলেমদের (উলেমা) আবির্ভাব ঘটলো শারীয়াহ্ -এর অভিভাবকরূপে এবং এমন এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন যার নানাভাবে, তুলনা করা যায় কনস্ট্যান্টাইন (Constantine)-এর ধর্মান্তরিত হওয়ার পরবর্তী যাজক-মণ্ডলীর মর্যাদার সঙ্গে। মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের যাজকমন্ডলীর মতই, তাঁরা তাঁদের জ্ঞান ও ধর্ম-ভীরুতার জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করতেন। এবং তাদের সমর্থনের প্রয়োজন হতো স্বৈরাচারী অথবা জনগণের অপ্রিয় শাসকের জন্য। তাঁরা বিরোধী দলীয় নেতৃত্বের ভূমিকাও পালন করতেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেরা গ্রহণ করার চাইতে তার উপরে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টাই করতেন বেশী।

রাজনৈতিক ও সামাজিক বিদ্রোহগুলো এখন থেকে ধর্মীয়ভাবে সমর্থন পেতে লাগলো। রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য রাজপরিবারের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অতি দ্রুত বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের অনৈক্যের গভীরে শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসতে থাকলো।

'খারিজী'বাদ ও 'শিয়া'বাদ (Kharijism & Shiism) এই দু'টি প্রধান আন্দোলন শুরু হয় খেলাফতের নির্বাচনের একটা দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। হযরত উসমানের (রাঃ) শাহাদতের (৬৪৪ খৃঃ) পর এরা মূল উম্মাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। খারিজীরাই প্রথম এই কথাটা বলা শুরু করে দেয় যে, শক্ত-পাপী কোন ব্যক্তি আর মুসলমান থাকে না। (ইসলাম থেকে সে 'খারিজ' – বহিষ্কৃত হয়ে যায়)। এই খারিজীরাই প্রথম 'জেহাদ' ধর্মযুদ্ধ করার ঘোষণা দেয় মুসলমানদেরই বিরুদ্ধে – যে মুসলমানদেরকে তাঁরা মনে করতো যে, এরা খাঁটি মুমিন নয়। খারিজীরা প্রথম দিকে হযরত আলীর (রাঃ) পক্ষেই ছিল। পরে, উসমানের হত্যাকাণ্ড থেকে উদ্ভূত বিরোধ অবসানের লক্ষ্যে আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যকার সালিশীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে, এরা আলীর পক্ষ ত্যাগ করে। তাদের কথা ছিলঃ বিচার একমাত্র আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত। – কোন মানবীয় আদালতের কোন এখতিয়ার নেই বিচারের। খারিজীরাই ছিল ধর্মীয় মতবাদ সৃষ্টির মূল হোতা। তারা কোন মুসলমানের গুণাবলী এবং অপর মুসলমান ও অন্যান্যদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে অত্যন্ত খুঁৎখুতে মনোভাবাপন্ন ছিল। এরাই ছিল সেই দল যারা ইসলামের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র ফের্কা বা সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভূত হয় প্রথম। এবং এরাই ছিল প্রথম যারা ঈমানের দ্বারা সত্যতা প্রতিপন্ন হওয়ার নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা এই বিশ্বাস রাখতো যে, কোন শক্ত গোনাহ্গার মুসলমান থাকতে পারে না, এবং সে ঈমানে বা ধর্মে পুনঃপ্রবেশ করতে পারে না; বরং তাকে তার পরিবারসহ হত্যা করা উচিত। তার সকল অ-খারিজীদেরকে মনে করতো সমাজচ্যুত এবং অমুসলমান। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) মদীনার মুনাফেকদের জানতেন এবং তাদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকেও জানতেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই তিনি (সাঃ) গ্রহণ করেননি। তিনি (সাঃ) কোন মুসলমানেরই ঈমানের মান বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিচার করেন নি।

খারিজীরা সরাসরি কোরআন করীম এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর সুন্নাহ্-এর শিক্ষার সহিত সংঘাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা ঘোষণা দিয়েছিল 'বিচার একমাত্র আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত' (লা হুক্মা ইল্লা লিল্লাহ্)৩৩ এবং এটা ছিল

সুন্নাহ্‌র সম্পূর্ণ পরিপন্থী। রসূলে পাক (সাঃ) ইহুদী গোত্র বনু কোরায়জাহ্‌র ভাগ্য নির্ধারণের জন্য 'হাকাম' (বিচারক)-রূপে নিযুক্ত করেছিলেন সা'দ বিন মুয়াজকে এবং তাঁর (রাঃ) দেওয়া রায়কেই কার্যকর করা হয়েছিল।[৩৪] সা'দ প্রদত্ত রায় সম্পর্কে 'সহীহ্ মুসলিম'-এর বর্ণনার উপরে–মন্তব্য করতে গিয়ে আল্ নব্‌বী (মৃত্যু হিঃ ১২৭/খৃঃ ৬৭৬) বলেছেনঃ মুসলমানদেরকে তাদের কলহ-বিবাদে 'তাহ্‌কিম'[৩৫] অবলম্বন করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ যদি দু'টো মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে কোন যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বর্তায় অন্যান্য মুসলমানদের উপরে। পবিত্র কোরআন বলে ঃ

> 'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর, এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।"(আল্ হুজুরাত–৪৯ঃ১১)

মুসলমানদেরকে 'অবিশ্বাসী' ঘোষণা করা এবং তাদেরকে শুধু এইজন্য শাস্তি দেওয়া যে, তাদের সাধারণ আদর্শাবলী একটা বিশেষ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সাধারণ আদর্শাবলী থেকে আলাদা – এর অর্থাৎ' তাক্‌ফির' – এর কোন স্থান নেই ইসলামে। রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন – যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র একত্ব এবং মুহাম্মদ (সাঃ)–এর নবুওয়তের উপরে বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়, সে মুসলমান।[৩৬] এবং এটাই সেই একমাত্র সংজ্ঞা যদ্বারা একজন মুসলমানের বিচার করা যেতে পারে। 'তাকফির'–এর বিষয়টির উপরে আলোচনা করতে গিয়ে বার্নার্ড লেউইস (Bernerd Lewis) বলেছেনঃ

> "এমনকি, প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করাও আপনাআপনি 'তাকফির' বলে গণ্য হতো না। ৯২৩ সালে প্রধান কাজী ইবনে বুহাল 'কারমাথিয়ান' বিদ্রোহীদেরকে কাফির বা অবিশ্বাসী বলতে রাজী হননি এই কারণে যে, তারা তাদের লিখিত চিঠি-পত্রের শুরুতে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি প্রার্থনা জানাতো। অতএব, এথেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হতো যে, তারা মুসলমান ছিল। শাফীঈ আইন এই ব্যাপারে জোর দেয় যে, কোন ফের্কা বা সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি, এমনকি বিদ্রোহ করলেও, মুসলিমরূপে গণ্য হওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ, তার পরিবার এবং তার সম্পত্তি অলংঘনীয়, এবং সে যদি বন্দী হয়, তাহলে তাকে সংক্ষিপ্ত বিচারে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া যাবে না কিংবা দাসরূপেও বিক্রী করা যাবে না"।[৩৭]

'তাক্‌ফির'৩৮ তবু, প্রবর্তিত হয়েছিল আইন বিশারদদের দ্বারাই। যেমন, আমরা দেখেছি যে, হযরত আলীকে (রাঃ) অভিযুক্ত ও অমান্য করার জন্য খারিজীদের একটা অজুহাত। কিন্তু খারিজীদের উদ্ভাবিত এই বেদাতকে গ্রহণ করেও আইন বিশারদরা 'মুসলমান' –এর কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্বাচন করতে পারেননি। তের শ' বছরের ইসলামের ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়ার কারণে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মুসলমানদের কোন সংখ্যা বের করা সম্ভব হবে না। কায়রোতে মাইমোনাইডদেরকে৩৯ এবং লেবাননে ম্যারোনাইট আমীর ইউনিসকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।৪০ এবং রশীদ-উদ্-দীন তাবরীযকে নির্যাতন করার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।৪১তবে, এই জাতীয় দৃষ্টান্ত খুব বিরল। মুঘল ভারতে মাত্র একটি ঘটনারই বিবরণ মিলে। একজন পর্তুগীজ ভিক্ষু ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং সে পরে পুনরায় তার পূর্বের ধর্মে ফিরে যায়। তাকে আওরঙ্গাবাদে হত্যা করা হয়।৪২ তার হত্যার কারণ ছিল রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়। এই ভিক্ষুর বিরুদ্ধে গভীর সন্দেহ ছিল যে, সে ইসলামের আবরণে পর্তুগীজদের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করতো।

'জাদ ইবনে দিরহাম'কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল হিশাম বিন্ আব্দুল মালিকের আদেশে কুফা অথবা ওয়ানি-তে (হিঃ ১২৪/১২৫ হিঃ/৭৪৬ খৃঃ)। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি মুতাজিলাদের 'কোরআন সৃষ্ট' ও ' স্বাধীন ইচ্ছা' মতবাদকে পেশ করেছিলেন। ১৬৭/১৬৮ হিজরীতে (খৃঃ ৭৮৮) ইরাকী কবি বশীর বিন বুর্দ 'যান্দাকাহ্' –এর অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং তাঁকে পিটানো হয় ও 'বাতিহা'র একটা জলভূমিতে ফেলে দেওয়া হয়। আল হুসাইন বিন মনসুর হাল্লাজকে হত্যা করা হয় ৩০৯ হিজরীতে (খৃঃ ৯৩০)। তাঁর (রহঃ) বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার (Blasphemy) এই অভিযোগ ছিল যে, তিনি খোদার সহিত গভীর মিলনের (হুলুল) দাবী করেছিলেন। শাহাব–উদ–দীন ইয়াহ্ ইয়া আল্ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে আল্ মালিক আল্ জাহিরের আদেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় হিঃ ৫৭৮/খৃঃ ১১৯৯ সনে। তাঁর অপরাধ ছিল যে, তিনি এমন সমস্ত কিছুকেই –যার প্রাণ আছে, যা চলাফেরা করে, যার সত্যিই কোন অস্তিত্ব আছে, এমনকি আলোর প্রতীককেও – খোদাতা'লার প্রমাণরূপে মান্য করতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শহীদ ছিলেন মুহাম্মদ সাঈদ সারমাদ্। সারমাদের পিতামাতা ছিলেন ইহুদী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন কাশানে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি 'রাব্বি' মতাবলম্বী ছিলেন। এই বিখ্যাত পারস্য কবি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় আওরঙ্গজেবের

আমলে (১৬৫৮–১৭০৭)। দিল্লীর জামে মসজিদের উল্টো দিকে তাঁর 'মাযার' (সমাধি) অবস্থিত। প্রত্যহ শত শত মসুলমান তাঁর মাযার যেয়ারত করে, ফুল দেয় এবং 'ফাতেহা' পাঠ করে।

আফগানিস্তানে দু'জন আহ্‌মদীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এই অজুহাতে যে, তাঁরা কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদকে (আঃ) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী বলে মেনেছিলেন।এঁদের একজন সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রাঃ) –আমীর হাবীব উল্লাহ্ খানের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। তাঁকে ১৯০৩ সালে সঙ্গেসার করে (পাথর মেরে) হত্যা করা হয়। এবং একইভাবে হত্যা করা হয় মৌলবী নেয়ামত উল্লাহ্‌কে (রহঃ) ১৯২৪ সালে। উভয়কেই হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর দাবী অস্বীকার করবার সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

মুহাম্মদ মাহ্‌মুদ ত্বাহা প্রাণদন্ডে দন্ডিত হন সুদানে ১৯৮৫ সালে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কোরআনী শারীয়া'র মদনী অংশের কার্যকারিতা আর নেই।

একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, ওসমানীয় (অটোম্যান) সুলতান, একটি ধর্মীয় সাম্রাজ্যের প্রধান এবং খলীফাতুল মুসলেমীন হওয়া সত্ত্বেও, বাহাউল্লাহ্‌কে (১৮১৭–৯২) 'ইরতেদাদ' অর্থাৎ ধর্মত্যাগের জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ দেননি। বাহাউল্লাহ্ নিজেকে বাব৪৩–এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে একজন 'প্রতিশ্রুত ব্যক্তি' বলে দাবী করেছিলেন এবং 'বাহাঈজম'কে প্রবর্তিত করেন একটি ধর্মরূপে। বাহাঈজম ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ছিল, এবং এখনও আছে। বাহাঈজমের ঘোষণা হচ্ছে, বাহাউল্লাহ্‌র আগমনের ফলে পবিত্র কোরআন ও মুহাম্মদ (সাঃ)–এর শিক্ষা সেকেলে বা বাতিল হয়ে গেছে। বাহাউল্লাহ্‌কে জেল দেওয়া হয় হাঈফার নিকটস্থ আক্কায় (আক্রা)। অতঃপর ফিলিস্তীনে (বর্তমান ইসরাঈল)। কিন্তু, সাব্বাতাঈ জেভী (১৬২৭–'৭৬) নামক জনৈক ইহুদী সন্ন্যাসী যখন ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজেকে 'মসীহ' বলে দাবী করে, তখন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শাইখুল ইসলাম তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করেন। তাকে গ্রেফতার করা হয়। সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার দাবী প্রত্যাহার করে, এবং ইসলাম গ্রহণ করে। বাহাউল্লাহ্ নিজেকে খোদার এক নতুন প্রকাশ বলে দাবী করেছিল এবং ইসলাম পরিত্যাগ করেছিল। কিন্তু তার ইরতেদাদ বা ধর্মত্যাগের জন্য তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়নি। কারণ, ওসমানী সাম্রাজ্যের আইন শৃংখলার বিরুদ্ধে সে কোন হুমকী ছিল না।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, 'ইরতেদাদ' বা ধর্মত্যাগের কনসেপ্ট ব্য ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বহির্ভূত একটি ধারণা। এবং ধর্ম পরিত্যাগের জন্য এই দুনিয়াতে কোন শাস্তি নেই। কিন্তু যে সকল আলেম (উলেমা) 'তদন্ত আদালত' –এর সামনে বক্তব্য পেশ করেছিলেন, (এই তদন্ত আদালত গঠিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালের পাঞ্জাব দাঙ্গার তদন্তের জন্য ১৯৫৪ সালের পাঞ্জাব এ্যাক্ট–এর অধীনে), তাঁরা জোরের সঙ্গে দাবী করেছিলেন যে, 'ইরতেদাদ' ইসলামী রাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। এঁদের মধ্যে ছিলেনঃ

> মওলানা আবুল হাসানাত সাইয়াদ মুহাম্মদ আহমদ কাদরী, প্রেসিডেন্ট, জামিয়ত-উল্-উলাম-ই-পাকিস্তান, পাঞ্জাব; মওলানা আহমদ আলী, সদর, জামিয়ত-উল-উলামা-ই-ইসলাম, পশ্চিম পাকিস্তান; মওলানা আবুল আলা মওদুদী, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন আমীর জামাতে ইসলামী, পাকিস্তান; মুফতী মুহাম্মদ ইদরিস, জামে আশরাফিয়া, লাহোর, সদস্য জামিয়ত–উল–উলামা–ই–পাকিস্তান; মওলানা দাউদ গজনবী, প্রেসিডেন্ট জামাতে আহ্‌লে হাদীস, মাগ্‌রেবী পাকিস্তান; মাওলানা আব্দুল হালীম কাসেমী, জমিয়ত–উল–উলামায়ে ইসলাম পাঞ্জাব; এবং জনাব ইব্রাহীম আলী চিশ্‌তী।৪৪

তাঁদের এই জোর দাবীর উপরে মন্তব্য করতে গিয়ে তদন্ত আদালত বলেছিলঃ

> এই মতবাদ অনুযায়ী, চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান যদি তাঁর বর্তমান ধর্মীয় বিশ্বাস জন্মসূত্রে প্রাপ্ত না হয়ে থাকেন, বরং তিনি যদি তাঁর নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় আহ্‌মদী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই মৃত্যুদন্ড দিতে হবে। এবং একই ভাগ্যের শিকারে পরিণত হবে দেওবন্দীরা এবং ওয়া'হাবীরা (এদের মধ্যে থাকবেন–মওলানা মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী, সদস্যঃ বোর্ড অব তালিমাত–ইসলামী, যা পাকিস্তানের কনস্টিটুয়েন্ট এসেমব্লীর সঙ্গে সংযুক্ত; এবং মওলানা দাউদ গজনবী) যদি এই আলেমরা (যাঁরা প্রদর্শিত হয়েছেন এই 'ফতোয়ার' সুন্দর একটি বৃক্ষের পাতায় পাতায় দাঁড়ে বসানো অবস্থায়ঃ এক্সিবিট ডি. ই. ১৪) কেউ তেমন কোন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হয়েই যান। এবং মওলানা মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী যদি রাষ্ট্র প্রধান হন তাহলে, তিনি দেওবন্দীদের দ্বারা ঘোষিত ইসলাম থেকে 'কাফির' হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদেরকে পৃথক করে ফেলবেন এবং তাদেরকে হত্যা করবেন, যদি তারা 'মুরতাদ', –এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে, অর্থাৎ যদি তারা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম পালন না করে

ধর্মীয় মতাদর্শ পরিবর্তন করে থাকে, তাহলে তারা মুরতাদ বলে সাব্যস্ত হবে।

আমাদের তদন্ত চলাকালে দেওবন্দীদের 'ফতওয়া' – (ইক্সিবিট ডি.ই.১৩–যাতে বলা হয়েছে যে, ইস্‌না আশারী শিয়ারা কাফের ও মুরতাদ) তার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু, মওলানা মুহাম্মদ শফী বিষয়টি দেওবন্দ থেকে যাচাই করে দেখেন এবং সেই মাদ্রাসার রেকর্ড-পত্র থেকে ফত্‌ওয়াটির একটি কপি সংগ্রহ করেন, –যাতে স্বয়ং মওলানা মুহাম্মদ শফীসহ দারুল উলুম মাদ্রাসার সকল শিক্ষকেরই দস্তখত ছিল। সেই সব রেকর্ড–পত্রে, বস্তুতঃ এ কথাই বলা আছে যে, যারা হযরত সিদ্দীকে আকবর–এর 'সাহাবিয়াত'–এ বিশ্বাস করে না, এবং যারা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার 'কাযিফ' এবং কোরআনের 'তেহ্‌রিফ' –এর অপরাধে অপরাধী – তারা কাফের। এই অভিমতের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণকারী আর একজন হচ্ছেন জনাব ইব্রাহীম আলী চিশ্‌তী, যিনি এই বিষয়টি জানেন এবং এ নিয়ে গবেষণাও করেছেন। তিনি মনে করেন যে, শিয়ারা কাফের, কেননা, তারা বিশ্বাস করে যে, হযরত আলী আমাদের নবী করীম (সাঃ) -এর নবুওয়তের অংশীদার ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যদি কোন সুন্নী তার ধর্মমত পরিবর্তন করে শিয়াদের সঙ্গে একমত হয়ে যায়, তাহলে সে 'ইরতেদাদ'–এর অপরাধে হত্যাযোগ্য হবে কিনা; কিন্তু তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। শিয়াদের মতে সকল সুন্নীরাই কাফের, এবং 'আহলে কোরআন' যারা, (যারা হাদীসকে নির্ভরযোগ্য মনে করে না, অতএব, তা মানা বাধ্যকরও মনে করে না) তারাও কাফের। অনুরূপভাবে, যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন, তারাও কাফের। এর মোট ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, শিয়া, সুন্নী, দেওবন্দী, আহ্‌লে হাদীস, ব্রেলভী কেউই মুসলমান নয়। এবং তাহলে, ব্যাপারটা এই দাঁড়াবে যে, রাষ্ট্রের সরকার যদি এমন কোন দল দ্বারা পরিচালিত হয়, যে দল অন্যদলকে কাফের মনে করে, তবে মতাদর্শ পরিবর্তনের সুনিশ্চিত পরিণাম হবে প্রাণদণ্ড।

এই মতবাদের পরিণাম কি,–তা বুঝে উঠতে খুব বেশী একটা চিন্তা–ভাবনার প্রয়োজন হবে না, যদি আমরা মনে রাখতে পারি যে, আমাদের সামনে কোনও দু'জন আলেমও 'মুসলমান'–এর প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ধারণে কখনই একমত হতে পারেননি। বস্তুতঃ তাঁদের সবার সংজ্ঞাকে যদি সাকল্যকেই গ্রহণ করা হয়, তাহলে যে সকল কারণে কোন ব্যক্তিকে ধর্মত্যাগের জন্য অভিযুক্ত করা যাবে, তার সংখ্যা এত বিপুল হবে যে, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না।[৪৫]

টীকাসমূহ

১. সহীহ্ আল্-বুখারী, বাব কিতাবাত আল্–ঈমান আন্–নাস

২. প্রাগুক্ত, কিতাব আস্ সালাত, বাব ফযল ইস্তাক্বাল আল্ ক্বিবলাহ্

৩. আল্-গাজ্জালী, ফয়সাস আত্ তাফ্রিফাহ্

বায়ন্ আল্ ইসলাম ওয়াল জান্দাকাহ্ (কায়রো, ১৯০১), ৬৮;

দ্রঃ বার্নাড লেউইস (Bernerd Leuis) ইসলাম ইন হিস্টারীঃ আইডিয়াজ, মেন এণ্ড ইভেন্টস্ ইন দি মিড্ল্ ইষ্ট' (লন্ডন, ১৯৭৩), ২৩২

৪. মুনীর কমিশন রিপোর্ট (লাহোর, ১৯৫৪), ২৮

৫. আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম; 'সীরাত রসূল আল্লাহ্ 'সম্পাদনা ঃ এফ. উস্ টেন ফেল্ড (F. Wustenfeld) ২য় খন্ড গোটিনজেন (Gottingen), ১৮৫৬ -৬০১, ৯৮৪, অনুবাদ এ. গুইলামি, 'দি লাইফ অফ মোহাম্মদ' (লন্ডন, অক্সফোর্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭০) পৃঃ ৬৬৭

৬. মুসনাদ ইমাম আহমদ হাম্বল, খন্ড ৫, ২৬০

৭. মুফরাদাত আল্ কোরআন

৮. কোরআন ৬ঃ৬৭, আরও দেখুন ৬ঃ১০৮, ১০ঃ১০৯, ১৭ঃ৫৫, ৩৯ঃ৪২ এবং ৪২ঃ৭। 'ওয়াকিল' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন–ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীঃ 'তফসীরে কবীর (কায়রো, ১৩০৮ হিঃ) খন্ড ৪, ৬২-৩, এবং–মুহাম্মদ আব্দুহ্ঃ তফসীর আল্ কোরআন আল্ শাহীর বি তাফ্সীর আল-মানার, সম্পাদনায়ঃ মুহাম্মদ রশীদ রিদা (বৈরুত, ১৩৩৭ হিঃ) খঃ৭, ৫০১–৩, ৬৬২–৩.

৯. জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

১০. আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম 'কিতাব সীরাত রসূল আল্লাহ্' ৯২৭ উদ্ধৃত।

১১. প্রাগুক্ত. ৩৮১

১২. প্রা. ৩৮৪

১৩. সহীহ্ আল্–বুখারী (কায়রো, তারিখ বিহীন) খন্ড. ১, অধ্যায় ৩, ২৮

১৪. ইবনে হিশাম. উঃ ৮১৮

১৫. প্রাগুক্ত. ৮১৯

১৬. প্রা. ৮১৮–১৯

১৭. প্রা. ৮১৯.

১৮. প্রা.

১৯. প্রা. ৮২০

২০. প্রা. ৪৬৮–৯

২১. প্রা. ৮১৯

২২. প্রা., আল্–যুরকানী, শারাহ্ আল্ মাওয়াহিব আল্–লাদুন্নিয়াহ্ (কায়রো ১৩২৫ হিঃ) ২য় খন্ড, ৩১৫, দ্রঃ শায়ের আলী কাতলী মুরতাদ আওর ইসলাম (অমৃতসর, ১৯২৫), ১১৯.

২৩. ইবনে হিশাম. উঃ, ৭২৮

২৪. প্রা. ৮১৯

২৫. প্রা.

২৬. মুহাম্মদ ইদরিস্ আল শাফীঈ, কিতাব আল্ উম্ম্ সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ জাহ্‌রী আল নাজ্জার (কায়রো তা. বি.) খঃ ৮, ২৫৬

২৭. আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আল্–তাবারী, তারিখ আল্–রসূল ওয়া আল্-মূলুক, সম্পাদনায়, এম. জে. ডি গোয়েজি (লেইডেন, ১৯৬৪) খঃ ৪, ১৮৭৪.

২৮. সি. এইচ. বেকার. 'দি এক্সপানসান অব দি স্যারাসিন্‌স, দি কেম্ব্রিজ মেডিয়েভেল হিস্টরী (নিউ ইয়র্কঃ ম্যাকমিলাক, ১৯১৩) খ. ২. ৩৩৫

২৯. মুহাম্মদ ইদরিস আল্–শাফীঈ, উঃ, ২৫৫–৬

৩০. আবদ্ আল হামিদ হিবেট –উ– আল্লাহ্ ইবনে আল–হাদিদ, 'শরাহ নাহজ আল্–বালাগাহ্, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ আবু আল–ফযল ইব্রাহীম (কায়রো, ১৯৫৬–৬৪), খ. ১৩, ১৮৭

৩১. শি. এইচ. বেকার, উঃ, ৩৩৫.

৩২. বার্নার্ড লেউইস, 'দি এ্যারাব্‌স্ ইন হিস্টরী' (লন্ডন, ১৯৫৮), ৫১–২

৩৩. আশারী, 'মাকালাত, খ. ১, ১৯১

৩৪. হিবনে হিশাম, উঃ, ৬৮৮-৯

৩৫. সহীহ মুসলিম উইথ শারাহ, আল্-নওয়ায়ী (লাহোর, ১৯৫৮, ৬২), খঃ ২, ১১২-১৩.

৩৬. বিভিন্ন বর্ণনার জন্য শব্দের কিঞ্চিৎ পার্থক্য সম্বলিত, দেখুনঃ সহীহ্ আল্-বুখারী এবং সহীহ 'মুসলিম কিতাব আল্-ঈমান'.

৩৭. বার্নার্ড লেউইসঃ 'ইসলাম ইন হিস্টরী' উঃ, ২৩৩

৩৮. বিস্তারিত দেুখনঃ প্রাগুক্ত, উঃ ২১৭-৩৬, এবং 'দি জুস অব ইসলাম' (প্রিন্সটন, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪), ৫৩-৪.

৩৯. বার্নার্ড লেউইসঃ 'দি জুস অব ইসলাম '(The Jews of Islam)উঃ ১০০

৪০. ইগনাজ গোল্ডজিহারঃ 'মুহাম্মদ এণ্ড ইসলাম' অনুবাদঃ কাতে চ্যাম্বারস্ সিলাঈ (Kate Chambers Seelye)ঃ নিউ হ্যাভেন ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯১৭, ৭৪, টীকা ৩

৪১. বার্নার্ড লেউইসঃ দি জুস্ অব ইসলাম, উঃ ১০১

৪২. স্যার যদুনাথ সরকারঃ 'শর্ট হিস্টরী অব আউরঙ্গজীব' (কলিকাতা, ১৯৫৪) ১০৫-৬

৪৩. কিন্তু বাব (আত্মার দরজা) মির্যা আলী মোহাম্মদ; নুবুওয়তের দাবীদার, তাবরীজে, জুলাই ৯, ১৮৫০ তারিখে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

৪৪. মুনীর কমিশন রিপোর্ট, ২১৮, ২১৯.

৪৫. প্রাগুক্ত. ২১৯

ধর্মত্যাগের শাস্তি

ইসলাম-ধর্মত্যাগীদের জন্য ইসলামে ইহজাগতিক শাস্তি আছে বলে কেউ কেউ যে একটা কথা বলে থাকেন, আসলে সেটা যে একটা কুতর্ক বা হেত্বাভাস (ফ্যালাসি) তা আমরা পূর্বেকার আলোচনায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে দেখিয়েছি পবিত্র কোরআন ও ইসলামের ইতিহাস থেকে। 'ইরতেদাদ' বা ধর্মত্যাগের মৃত্যুদণ্ড দানের পথে যারা ওকালতি করেন, তাঁরা সচরাচর যে দু'টি ঘটনার হাওয়ালা দিয়ে তাঁদের যুক্তি পেশ করেন, তার একটি হচ্ছেঃ ইকরামার একটি রেওয়ায়েত বা বর্ণনা, এবং অপরটিঃ হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর আমলের 'যাকাত' সম্পর্কিত ঘটনা। আমরা এখানে এ দু'টি বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

এটা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা মুশকিল যে, নির্যাতন করার যে ধারণা বা কনসেপ্ট, তা কি ইসলামের যমীনেই জন্ম গ্রহণ করেছে, না কি তা প্রাচ্যবিদদের কল্পনাপ্রসূত এমন একটি শিশু যাকে পরে তুলে নেওয়া হয়েছে ইসলামেরই কোলে। বিষয়টি আমি ইসলামী ইতিহাসের আলোকেই বিচার করে দেখেছি, এবং আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, এই ধারণাটার উদ্ভব ঘটে প্রথমতঃ ইসলামিক বিশ্বেই; এটা সূচনা করার জন্য আমরা যে প্রাচ্যবিদদের ঘাড়ে দোষ চাপাই, সেটা আমাদের ভুল। তারা এটা মুসলমানদের কাছেই পেয়েছিল। এমনকি প্রাচ্যবিদদের জন্ম হওয়ারও পূর্বে, এই ধারণা মধ্যযুগীয় ইসলামিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বিরাজ করছিল। এটার উৎপত্তি হয়েছিল পরবর্তী উমাইয়া রাজবংশে। সারাটা আব্বসীয় আমলে এই ধারণার ক্রমাগত প্রসার ঘটেছিল এবং জোরদার হয়েছিল। কারণ, আব্বাসীয় বাদশাহ্‌রা শুধু ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধেই শাস্তি প্রয়োগ করতে চাইতেন না, বরং তারা নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধেও শক্তি প্রয়োগ করতে চাইতেন। এজন্য তাঁদেরকে তাঁদের প্রভাবাধীন মুসলিম বিশেষজ্ঞদের কাছে বার বার লাইসেন্স চাইতে হতো না। সুতরাং ধারণাটার উদ্ভব ঘটেছিল বাগদাদে, খেলাফতে রাশেদার১, পরবর্তী মুসলিম সরকাগুলোর আচরণ ও পলিসি থেকে।

বাইরে থেকে দেখে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা বিশ্বাস করে বসেছিল যে, এটা একটা ইসলামিক শিক্ষা। কিন্তু, আসলে, এটা কোনভাবেই ইসলামিক ছিল না। এটা ছিল কিছু সংখ্যক মুসলিম সরকারের আচরণের ভিত্তি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই ধারণাটার জন্ম এমন এক যামানায় হয়েছিল, যখন পৃথিবীর

সর্বত্রই প্রভাব ও আদর্শ বিস্তারের জন্য শক্তির প্রয়োগ করা হতো এবং এটাকে খারাপ কিছু বলেও মনে করা হতো না।

এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, শক্তি প্রয়োগে নিজের আদর্শের প্রসার করাকে ইসলাম সমর্থন করে বলে যে অভিযোগ, তা ইসলামী শিক্ষার উৎসসমূহের গবেষণালব্ধ কোন ফল নয়, তা বরং কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রের আচরণের উপরে গবেষণার ফল। এখন তো এমন একটা নতুন যুগের সূচনা হয়েছে যখন আমরা সমস্ত ইসলামী সাহিত্য এবং হাদীস ইত্যাদি সহজেই পেতে পারি এবং এখন পবিত্র কোরআনের অনুবাদও হয়েছে বহু ভাষায়। কাজেই, এখন যখন পাশ্চাত্যের গবেষকরা সরাসরি ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন, তখন তো আর এই অভিযোগ উত্থাপনে তাদের জিদ করাটা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। তাদের উচিত এই সমস্ত উৎসকে অবলম্বন করা এবং পবিত্র কোরআনের শিক্ষা, হাদীসের শিক্ষা এবং স্বয়ং রসূলে পাক মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চারিত্র্যের শিক্ষার উপরে গবেষণা করা।

বর্তমান প্রচেষ্টা হচ্ছে, গোটা বিষয়টাকেই পরীক্ষা করে দেখার একটা প্রচেষ্টা। এবং এটা কোন বিশেষ একটা যুগের মুসলমানদের আচরণের আলোকে করা হয়নি, করা হয়েছে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষার আলোকে এবং সেই শিক্ষা নবী করীম (সাঃ)-এর কথা ও কাজের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে, তারই আলোকে। কোন শিক্ষাকে তার অনুসারীদের চরিত্রের আলোকে বিচার করলে মানুষ প্রায়শঃই সেই শিক্ষার আসল রূপ নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে। এটা বিশ্বজনীনভাবেই লক্ষ্য করা গেছে যে, কিছুদিন পরেই সমস্ত ধর্মই তাদের অনুসারীদের চরিত্রের উপর প্রভাব খুইয়ে বসেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনি যদি আজকের অথবা প্রাচীন যুগের বৌদ্ধদের আচার-আচরণ নিয়ে গবেষণা করেন, কিংবা হিন্দু সরকারগুলোর বা অন্যান্যদের আচরণ নিয়ে স্টাডি করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, মূল শিক্ষার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক প্রায় নেই বল্লেই চলে। বিশেষ করে, রাজনীতিকে ধর্মের সহিত জড়িয়ে ফেলা চলবে না। কোন একটা জাতির রাজনৈতিক আচরণকে সেই জাতির পালনীয় ধর্মের শিক্ষার দর্পণরূপে বিবেচনা করা যাবে না।

এটাই সেই পটভূমি যার প্রেক্ষিতে আমরা তাদের যুক্তি-প্রমাণগুলো পরীক্ষা করে দেখতে চাই, যারা বলে যে, ধর্মত্যাগের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু।

ধর্মত্যাগীর সংজ্ঞাঃ

পবিত্র কোরআন বলেঃ

'যদি তাদের ক্ষমতা থাকতো, তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেত। এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থাতেই মারা যাবে, সে যেন স্মরণ রাখে যে, এরাই সেই লোক যাদের আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হয়ে যাবে। এবং এরাই অগ্নির অধিবাসী, তারা ওতে দীর্ঘকাল ধরে থাকবে।" (আল্ বাকারা - ২ঃ২১৮)

এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ তরবারির ভয়ে (অথবা শাস্তির কারণে) শপথ নিয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার মৌলিক অধিকার রয়েছে তা করবার। কিন্তু, অপর কারো এ অধিকার নেই যে, তাকে মুরতাদ ঘোষণা করে। নিজেকে মুরতাদ ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র তারই। এই অধিকার পবিত্র কোরআনে অপর কাউকেই দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ, যে কেউ তার ধর্ম পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন, কিন্তু কারও এ অধিকার নেই যে, সে ধর্ম পরিত্যাগ করাকে অন্যের উপরে চাপিয়ে দেয়। অতএব ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ অথবা উলেমা অথবা কোন অসহিষ্ণু ব্যক্তি অথবা সরকার কর্তৃক কাউকে মুরতাদ বানানো যাবে না।

পবিত্র কোরআন আরও বলেঃ

"যারা নিজেদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায় তাদের উপর হেদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর, নিশ্চয় শয়তান তাদেরকে বিপথে প্রলুব্ধ করে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়।" (মুহাম্মদ – ৪৭ঃ২৬)

'ইরতেদাদ' বা ধর্মত্যাগ সম্পর্কে কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াত।
কোরআন করীমে বলা হয়েছেঃ

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের দীন থেকে ফিরে যাবে (সে যেন স্মরণ রাখে যে,) আল্লাহ্ অচিরেই (তার পরিবর্তে) এমন এক জাতিকে আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে, যারা মুমিনদের প্রতি নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করবে এবং কোনও ছিদ্রান্বেষণকারীর ছিদ্রান্বেষণকে ভয় করবে না। এ হচ্ছে আল্লাহ্র কৃপা (ফযল), তিনি যাকে চান তা দান করেন। বস্তুতঃ, আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞানী"। (আল্ মায়েদা – ৫ঃ৫৫)

"যে কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাকে (অস্বীকার করতে) বাধ্য করা হয়েছে যদিও তার অন্তর ঈমানে প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত; কিন্তু যারা অবিশ্বাসের জন্য নিজেদের বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব (ক্রোধ) আপতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ (যন্ত্রণাদায়ক) শাস্তি।" (আন্ নাহল – ১৬:১০৭)

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, অতঃপর অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে, অতঃপর অস্বীকার করে, এবং অস্বীকারে তারা বেড়ে যায়, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করবেন না।" (আন্ নিসা – ৪:১৩৮)

"এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল ; তার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই গত হয়ে গেছে। অতএব, সে-ও যদি মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালির উপরে (তৎক্ষণাৎ উল্টোমুখে) ফিরে যাবে ? এবং যে ব্যক্তি স্বীয় গোড়ালিদ্বয়ের উপর ফিরে যাবে, সে আল্লাহ্‌র আদৌ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবং অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে প্রতিদান দেবেন।" (আলে ইমরান – ৩: ১৪৫)

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতসমূহ থেকে যথাসাধ্য কল্পনা খাটিয়েও ধর্মত্যাগের জন্য কোন ইহজাগতিক শাস্তির কথা উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

'সূরা আত্-তাওবা'

পবিত্র কোরআন থেকে ধর্মত্যাগের শাস্তির সমর্থনে, অন্ততঃ একটি হলেও আয়াত খুঁজে বের করার বেপরোয়া প্রচেষ্টায়, অবশেষে যে দু'টি আয়াতের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে, 'সূরা আত্ তাওবা'র ১২ ও ১৩ নং আয়াতদ্বয়। আমরা এই সূরাটির ৩ থেকে ১৪ নং আয়াতগুলিকে নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এই আয়াতগুলি নিজেরাই নিজেদের ব্যাখ্যা। এগুলিকে কেউ যদি ভিন্নভাবে উপলব্ধি করতে চায়, তবে তার অনুরূপ যাবতীয় প্রয়াসকে এই আয়াতগুলি নিজেরাই অগ্রাহ্য করে অবজ্ঞাভরেঃ

৯:৩ এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পথ থেকে হজ্জে আক্‌বরের (মহত্তর ও বৃহত্তর হজ্জের) দিন জনসাধারণের এই ঘোষণা যে, আল্লাহ্ মুশরেকদের নিকট থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রসূলও। সুতরাং যদি তোমরা তওবা

কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, এবং যদি তোমরা বিমুখ হও, তাহলে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে (পরিকল্পনায়) ব্যর্থ করতে পারবে না। এবং যারা অবিশ্বাস করেছে তাদেরকে শাস্তির সংবাদ দাও।

৯ঃ৪ কিন্তু মুশরেকদের মধ্যে তারা ব্যতীত যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার পালনে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তারা কাউকেও সাহায্য করেনি। সুতরাং তোমরা তাদের সঙ্গে তাদের অঙ্গীকার তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।

৯ঃ৫ এবং যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিক্রান্ত হবে, তখন তোমরা মুশরেকদেরকে (এই বিশেষ দলকে) যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে গ্রেফতার কর, তাদেরকে অবরুদ্ধ কর, এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৯ঃ৬ এবং যদি মুশরেকদের মধ্য থেকে কেউ তোমার নিকট আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও যেন আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। এটা এইজন্যে যে, তারা এমন এক জাতি যারা কিছুই অবগত নয়।

৯ঃ৭ আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁর রসূলের নিকট (এ সকল) মুশরেকদের কীভাবে চুক্তি হতে পারে, কেবল মাত্র সেই সকল (মুশরেক) ব্যতীত যাদের সাথে তোমরা পবিত্র মস্‌জিদের নিকটে চুক্তি করেছিলে? সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের সঙ্গে (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাহাদের সঙ্গে (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।

৯ঃ৮ কীভাবে (এটা হতে পারে) ? অথচ যদি তারা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয়, তাহলে তারা তোমাদের ব্যাপারে আত্মীয়তা ও চুক্তির কখনও মর্যাদা রক্ষা করবে না। তারা তোমাদেরকে তাদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করে, অথচ (তারা যা বলে তা) তাদের অন্তর অস্বীকার করে। বস্তুতঃ, তাদের অধিকাংশই দুস্কৃতিপরায়ণ।

৯:৯ তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্প-মূল্য গ্রহণ করেছে এবং (লোকদেরকে) তাঁর পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। নিশ্চয় তারা যা করছে তা অতিশয় মন্দ।

৯:১০ তারা কোন মুমিনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে না। বস্তুতঃ এরাই সীমালংঘনকারী।

৯:১১ কিন্তু যদি তারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ভাই। এবং আমরা আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি ঐ জাতির জন্য যাদের জ্ঞান আছে।

৯:১২ এবং যদি তারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করে, তাহলে তোমরা (এই শ্রেণীর) কাফেরদের নেতাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর–নিশ্চয় তাদের শপথের কোন বিশ্বাস নেই যেন (তারা অপকর্ম থেকে) নিবৃত্ত হয়।

৯:১৩ তোমরা কি সেই জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে নির্বাসিত করার সংকল্প করেছে, এবং তারাই তোমাদের বিরুদ্ধে (সংঘর্ষের) সূচনা করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে (জেনে রাখো) আল্লাহ্‌ই অধিকতর যোগ্য যে, তোমরা তাঁকে ভয় কর।

৯:১৪ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আল্লাহ্‌ তোমাদের হাত দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং তিনি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন, এবং এতদ্বারা মুমিন জাতির মনে স্বস্তি প্রদান করেন।

যাঁরা আয়াত নং ১২ এবং ১৩ থেকে এই আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'ইরতেদাদ' বা ধর্ম পরিত্যাগের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, তাঁরা অসংখ্য আয়াতের সঙ্গে তাদের এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে উদ্ভূত পরস্পর বিরোধিতার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। এই আয়াতগুলির সম্পর্ক মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পরবর্তী সময়কালের সঙ্গে (দ্রঃ আয়াত নং ৩), যখন মক্কার কোরেশরা শাস্তি প্রয়োগে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল।

ধর্ম পরিত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড–এই ধারণার প্রবক্তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই আয়াতগুলির প্রসঙ্গ মুশরেকরা যারা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং ধর্মকেও তারা বিদ্রূপ করতো; এখানে ধর্মত্যাগকারীদের কোন উল্লেখই নেই।

তারা তাঁদের দৃঢ় অঙ্গীকারের পরেও তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। যারা তোমার ধর্মের দুষমন হয়ে গেছে, তারাই প্রথম তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু করেছে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার যে অনুমতি তোমাকে দেওয়া হলো, তা সীমাবদ্ধ, তা কেবল তাদের সেই সকল নেতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাদের অঙ্গীকার অন্তঃসারশূন্য এবং মিথ্যা। অনুমতি দেওয়া হলো, যাতে তাদেরকে তোমার বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ কার্যকলাপ থেকে প্রতিহত করা যায়।

এটাই হলো এই আয়াতগুলির আসল তাৎপর্য, যার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেছেন প্রাণদণ্ডের প্রবক্তারা। বল প্রয়োগে মুসলমান করার অজুহাতে ধর্ম ত্যাগ করেছে–এমন সব লোকের সঙ্গে দূরতম কোনও সম্পর্কের উল্লেখ নেই এখানে। এইসব লোকের কথা বলা হয়েছে কোরআন করীমের অন্যত্রঃ

> "ওদের মধ্য থেকে যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে তাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ অচিরেই মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন; বস্তুতঃ, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান; এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।
>
> যারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বিতাড়িত করেনি, তাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়-বিচার করতে নিষেধ করেন না; নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়-বিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।
>
> আল্লাহ্ শুধু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বিতাড়িত করেছে, এবং তোমাদেরকে বিতাড়িত করতে অন্যদেরকে সাহায্য করেছে, এবং যারা তাদের সঙ্গে বন্ধত্ব করবে–তারাই যালেম হবে।" (আল্ মুমতাহানা – ৬০ঃ৮-১০)

সাময়িক অবিশ্বাসঃ

পবিত্র কোরআনের আর এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

> আহলে কিতাবের মধ্য থেকে একদল বলে, 'ঈমান এনেছে যারা তাদের উপর যা কিছু নাযেল করা হয়েছে তার উপর তোমরা দিনের প্রথম ভাগে ঈমান আন এবং তার শেষ ভাগে তা অস্বীকার কর, যেন তারা ফিরে আসে (তাদের ধর্ম থেকে)।" (আলে ইমরান – ৩ঃ৭৩)

এখানে 'আহলে কিতাব' বলতে মদীনার ইহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে। একটা ইহুদী চক্রান্ত এরকমও ছিল যে, তারা মুসলমানদের মধ্যে সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি করতো, এবং তা করতো এই আশায় যে, এতে করে হয়তো তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম পরিত্যাগ করবে। ধর্মত্যাগের শাস্তি যদি মৃত্যুদন্ডই হতো, তাহলে ইহুদীরা কি করে এই চক্রান্ত অবলম্বন করতে পেরেছিল? এই অপরাধ করার জন্য যদি কাউকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়ে থাকতো, তাহলে তা অন্যদের জন্য একটা ভীতিপ্রদ বাধা হতো, এবং অন্য কেউ আর এই পন্থা অনুসরণ করতো না।

মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তারা জিদ করে বলেন যে, এই আয়াতটিতে একটা ইহুদী দর্শনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে মাত্র, যা ইহুদীদের দ্বারা কখনই বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। এটা যদি কেবল একটা দর্শনই হয়ে থাকে, তবু এই আয়াত থেকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মত্যাগের জন্য এই পৃথিবীতে কোন শাস্তি নেই; অন্যথায় ইহুদীরা ঐ ধারণাটা পোষণ করতে পারতো না। তাছাড়া, এটা বলা ভুল যে, ঐ ধারণাটা ছিল মাত্র হাইপোথেটিক্যাল বা অনুমান নির্ভর। কেননা, হাদীসের গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত আছে যে, 'খাইবার এবং উরাইনাহ্-এর ১২ (বার) জন ইহুদী সন্ন্যাসী তাদের ঐ দর্শনকে কার্যেও প্রয়োগ করেছিল [২]। (দ্রঃ 'কিবলা' পরিবর্তনের ঘটনা)।

তফসীরকারগণ (ভাষ্যকাররা) সবাই একমত যে, এই সূরাটি (অধ্যায়টি) অবতীর্ণ হয়েছিল মক্কা বিজয় ও রসূলে পাক (সাঃ)-এর ওফাত-এর (মৃত্যুর) মধ্যবর্তী সময়কালে। এথেকে চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীরা তাদের ঐ চক্রান্ত কার্যকর করবার প্রচেষ্টা নিয়েছিল আরবে ইসলাম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। যদি ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুই হতো, তাহলে ইহুদীরা কি করে অমন একটা আত্মঘাতী ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কৌশল গ্রহণ করতে পেরেছিল? কি করে তারা মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতো দিনের বেলায় তাদের ধর্ম অনুসরণ করে দিনের শেষে তা পরিত্যাগ করতে, –যদি তারা জানতোই যে, ধর্মত্যাগের জন্য মুসলমানদেরকে হত্যা করা হবে?

হাদীস ঃ

ধর্মত্যাগের শাস্তি প্রাণদণ্ড – এই মতের প্রবক্তারা হযরত রসূলে পাক (সাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোর অপব্যাখ্যা করেছেন ইচ্ছামত, –সীমাহীনভাবে। কোন একটা হাদীসেও তাদের মতের কোন সমর্থন নেই। পক্ষান্তরে, এমন বহু

সংখ্যক হাদীস আছে, যা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মত্যাগের জন্য ইহজীবনে কোন শাস্তি নেই।

যাহোকে, বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ আলোচনার খাতিরে, আমরা এখানে সেই সমস্ত হাদীসেরও উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যেগুলিকে সচরাচর পেশ করে থাকেন মৃত্যুদন্ডের প্রবক্তারা তাঁদের মতের সমর্থনে।

(ক) আনাস থেকে আবূ কালাবাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আকাল বা উরায়নার লোকদেরকে মদীনার বাইরে গিয়ে তার উষ্ট্রীর পালের সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন। এই লোকগুলো উটের রাখালকে হত্যা করে এবং উটের পাল নিয়ে পালিয়ে যায়। যদিও, এটা সত্য ছিল যে, ঐ লোকগুলো ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তবু তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তা ধর্ম ত্যাগ করার জন্যে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছিল উটের পালের রাখালকে হত্যা করার জন্যে। (বানু বনী কেলাব গোত্রকে শাস্তি দানের জন্য একটি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল।'বনু উরায়না'র একটি দল – যারা বনী কেলাবের সঙ্গে বাস করতো তারা – দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় মদীনায় আসে এবং ইসলাম কবুল করে। এই লোকগুলো জ্বরে ভুগছিলো। তাদেরকে রসূলে পাক (সাঃ) -এর পশুচারণ ক্ষেত্রে পাঠান হয় যাতে তারা ভাল খাবার খেতে পায়– দুধ খেতে পায়। কিন্তু যখন এই লোকগুলো সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন তারা নির্মমভাবে সেখানকার পশুপালকদেরকে হত্যা করে এবং পনেরটি উষ্ট্রী নিয়ে পালিয়ে যায়। এদেরকেই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এদের সংখ্যা সম্ভবতঃ খুব কম ছিল।)

(খ) ইবনে খাতাল ছিল সেই চার ব্যক্তির অন্যতম যাদেরকে মক্কার পতনের পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সন্দেহ নেই যে, সে একজন ধর্মত্যাগী ছিল। কিন্তু সে নরহত্যার অপরাধেও অপরাধী ছিল। কেননা, সে ও তার সঙ্গী পথচারীকে হত্যা করেছিল। অতএব, স্পষ্টতঃই, খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্যই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। (দ্রঃ পূর্ববর্তী প্রবন্ধ)।

(গ) আর একটি ঘটনা হচ্ছে মাকীস বিশ সাবাবাহ্ সম্পর্কিত। মাকীস তার ভাই হিশামের হত্যার প্রতিশোধ নিতে একজন আনসারীকে হত্যা করেছিল। হিশাম জিকার্দের অভিযানকালে দৈবক্রমে নিহত হয়েছিল। এই ঘটনার পর মাকীস 'মুরতাদ' হয়ে যায়। তাকে মৃত্যুদণ্ড দান করা হয় একজন আনসারীকে হত্যা করার অপরাধে। (দ্রঃ পূর্ববর্তী প্রবন্ধ)।

উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি ঘটনায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত প্রত্যেকটি লোক ছিল খুন করার অপরাধে অপরাধী। এটা ঠিক যে, তারা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল, কিন্তু তারা যে নরহত্যা করেছিল, সেদিকে চোখ বন্ধ করে কে বলবে যে, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ধর্মত্যাগের জন্যই?

(ঘ) ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তারা একটি হাদীসের উপরে দারুণভাবে নির্ভর করে থাকেন। এই হাদীসটিতে ধর্মত্যাগের জন্য একজন স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দানের কথা বলা আছে। এই হাদীসটিকে অত্যন্ত অবিশ্বস্ত বললেও খুব কমই বলা হবে। আসল ঘটনা হচ্ছে, রসূলে করীম (সাঃ) কখনই কোন স্ত্রীলোককে ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেননি। ধর্মশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হেদায়াহ্'-তে বলা হয়েছেঃ

'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন নারীকে ইরতেদাদ বা ধর্মত্যাগের জন্য হত্যা করতে নিষেধ করেছেন; কারণ, শাস্তিমূলক বিধানের নীতি একটাই যে, এই জাতীয় ঘটনার শাস্তি পরকালের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। কেননা, ইহ-জীবনে শাস্তি দান করা হলে, তা হবে ধর্মত্যাগের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধেই বিচার করা, –যে বিচারের ভার একমাত্র খোদাতা'লার হাতেই ন্যস্ত। এর ব্যতিক্রম কেবল তখনই হতে পারবে, যখন তার উদ্দেশ্য হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিরস্ত করা (যুদ্ধের সময়ে)। স্ত্রীলোকেরা যেহেতু, তাদের প্রকৃতিগত কারণেই, যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়, সেহেতু কোনভাবেই কোন স্ত্রীলোককে ধর্মত্যাগের জন্য শাস্তি দান করা যাবে না।'

তাজ্জবের ব্যাপার হচ্ছে, মওদুদীর মত আলেমরা – যারা এই সকল হাদীসের বিশ্বাসযোগ্যতায় বহু মারাত্মক ত্রুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল বলেই মনে হয়, তারাও – এই জাতীয় দুর্বল বা যয়ীফ হাদীসের উপরে নির্ভর করেছেন – যেগুলিকে শ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম বিশেষজ্ঞরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(ঙ) আব্দুল্লাহ্ বিন সাদ এর ঘটনাটির কথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। (দ্রঃ 'ইসলামে ধর্মত্যাগ, প্রবন্ধ)। ধর্মত্যাগের জন্য যদি কোরআনী কোন শাস্তির বিধান থেকেই থাকতো,তাহলে রসূলে পাক (সাঃ)-এর যে কথা––কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়– তা-ই তাঁকে তাঁর আল্লাহ্র আইনের কঠোর অনুবর্তিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিত সুস্পষ্টরূপে। যদি, মৃত্যুই হতো ধর্মত্যাগের শাস্তি, তাহলে কি করে রসূলে পাক (সাঃ) আল্লাহ্র আইন অমান্য করলেন?

সাহাবীগণ

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এই ধারণার প্রবক্তাদেরকে না কোরআন করীম সমর্থন করে, না রসূলে করীম (সাঃ)-এর কোন প্রামাণ্য হাদীস। কিন্তু এই সব প্রবক্তার আস্তীনের মধ্যে আরও কিছু কূটবুদ্ধি লুকানো আছে। কাজেই, তাদের বাদবাকী তর্কগুলোকেও আরও বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তাদের এই যুক্তিগুলোর ভিত্তি হচ্ছে রসূলে পাক (সাঃ)-এর সঙ্গী (সাহাবী)–গণের (রাঃ) মতামত; স্বয়ং তাঁর (সাঃ) নিজের রায় নয়। শুরুতেই জেনে রাখা ভাল যে, সাহাবীদের (রাঃ) সিদ্ধান্ত বা মতামত গৃহীত হতে পারে ভাষ্যরূপে, তার কদর কোরআন মজীদের নির্দেশের সমান হতে পারে না। বড় জোর তা মতামতরূপেই গণ্য হতে পারে।

(ক) 'যাকাত' দানকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক ইরতেদাদ বা ধর্মত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল আমরা তার আলোচনা করে এসেছি পূর্ববর্তী প্রবন্ধে। আবস ও জুবইয়ান গোত্র দু'টি যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত ঘটায় মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে। হযরত আবূবকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর অভিযান থেকে ফিরে আসার পূর্বেই। মুরতাদরা ছিল আক্রমণকারী। তারা শুধু 'যাকাত' দিতেই অস্বীকার করেনি, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারিও ধারণ করেছিল। অতএব, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এবং তারা তাদের মধ্যকার মুসলমানদেরকে যবাই করেছিল, কাউকে কাউকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল এবং হত্যা করার পর মৃতদেহগুলোকে খন্ড-বিখন্ড করেছিল। এই ঘটনার ভিত্তিতে যারা বলেন যে, ধর্মত্যাগের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, তারা হয় সত্য ঘটনা জানেন না, নয়তো ইচ্ছাপূর্বক বিদ্রোহীদের দ্বারা নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যার ঘটনাটিকে নিতান্ত লঘু করে দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেন।

(খ) ঐসব প্রবক্তা অতঃপর প্রশ্ন তুলেন যে, ধর্মত্যাগের জন্য যদি কখনোও শাস্তি না-ই থাকে, তাহলে মুসায়লামা কায্যাবকে কেন ছাড়া হলো না? অথচ, সত্য ঘটনা হচ্ছে, মুসায়লামা রাজনৈতিক ক্ষমতার অভিলাষী ছিল। সে আবূ হানিফার সঙ্গে এসেছিল এবং সে রসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে প্রস্তাব পেশ করেছিল যে,তাকে তাঁর (সাঃ) খলীফা মনোনীত করা হোক। রসূলে পাক (সাঃ) মুসায়লামাকে বলেছিলেন যে, তিনি (সাঃ) তাঁকে

খেজুর গাছের একটা ডাঁটাও দিবে না। মুসায়লামা ফিরে যায় এবং ঘোষণা করে যে, আরবের অর্ধেক তার অধিকারভুক্ত। সে রসূলে পাক (সাঃ)–এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করে এবং সেই পত্রে সে দাবী করেঃ 'কর্তৃত্বে আমি আপনার অংশীদার নিযুক্ত হয়েছি।' রসূলে করীম (সাঃ) তার জবাব দেন কোরআন করীমের সূরা আরাফের ১২৯ নং আয়াতটি উদ্ধৃতি দিয়ে।[৪] মুসায়লামা নবুওয়তের দাবী করার পর রসূলে পাক (সাঃ)-এর এক সাহাবী হাবীব বিন যায়েদকে গ্রেফতার করে এবং তাঁর (রাঃ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ একটার পর একটা কেটে ফেলে, অবশেষে, তার লাশের টুকরোগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। মৃত্যুদন্ডের প্রবক্তারা এই অতি নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনাকেও উপেক্ষা করেন এবং দাবী করে যে, মুসায়লামার একমাত্র অপরাধ ছিল যে, সে ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল। কিন্তু, যদি সে হত্যার অপরাধে অপরাধী না হতো, তাহলেও কি তাকে শুধু ধর্ম পরিত্যাগের জন্যই হত্যা করা হতো ? তার বিচার কি এজন্যে হয়নি যে, সে নরহত্যা করেছিল, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলেছিল, এবং দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল ? এমন কোন কাটা-ছেঁড়া বা সামান্যতম প্রমাণও নেই যে, মুসায়লামা কর্তৃক তাঁর (সাঃ) নবুওয়তকে প্রত্যাখ্যান করার কথা শুনেই রসূলে পাক (সাঃ) মুসায়লামাকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন কিংবা তাঁর কোন সাহাবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে হত্যা করার জন্য। রসূলে করীম (সাঃ) কর্তৃক এ ব্যাপারে কোন আদেশ প্রদানের কোনও প্রমাণ খুঁজে না পাওয়ার ফলে, মওলানা মওদুদী একটা ইচ্ছার আশ্রয় নিয়েছেন। কথিত সেই ইচ্ছায় নাকি রসূলে পাক (সাঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় প্রকাশ করে গেছেন যে, মুসায়লামাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু, এটা আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, রসূলে পাক (সাঃ) অনুরূপ কোন ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও, তাঁর (সাঃ) প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রাঃ) তা উপেক্ষা করেছেন এবং তা পূরণের জন্য কোন অভিযান প্রেরণ করেননি। কেন তাহলে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) মুসায়লামা প্রথমে আক্রমণ শুরু না করা পর্যন্ত এবং প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন ? আমরা দেখতে পাই যে, মুসায়লামা একমাত্র বনু হানিফা গোত্রেরই চল্লিশ হাজার যোদ্ধার এক সেনাবাহিনী গঠন করে খালিদ বিন ওলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ

হয়েছিল। মুসায়লামাই প্রথম যুদ্ধ–বিগ্রহের সূচনা করে, এবং সে মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। এবং তখনই কেবল হযরত আবূ বকর (রাঃ) মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেন তার বিদ্রোহের জন্য এবং হাবীব বিন্ যায়েদের নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য।৫

(গ) আরও একটা ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় এবং সেটা হলো নবুওয়তের আর এক ভন্ড দাবীদার তুলায়হার ঘটনা। সে-ও কেবল একজন ভণ্ড দাবীদারই ছিল না, বরং সে ছিল উকাশা বিন মোহ্সিন এবং সাবেত বিন আকরাম আনসারীর হত্যাকারী। তার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে খালেদ বিন ওলীদ একজন দূত প্রেরণ করেন তুলায়হার কাছে শান্তি স্থাপনে সম্মত হতে এবং রক্তক্ষয় এড়াতে। এক্ষেত্রেও, মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তারা এই সত্যকে উপেক্ষা করেন যে, ধর্মত্যাগের জন্য যদি মৃত্যুদণ্ডেরই বিধান থাকতো, তাহলে খালিদের পক্ষে তুলায়হার নিকটে ক্ষমার কথা জানিয়ে দূত প্রেরণের কোনও সুযোগই থাকতো না।৬

(ঘ) আসওয়াদ আনাসীর ঘটনাটিও অনুরূপ আর একটি ঘটনা। সে-ও তার ধর্মত্যাগের সঙ্গে তার বিদ্রোহের পতাকাও উড্ডীন করেছিল। সে ইয়েমেনের মুসলিম গভর্ণর শাহর বিন বাজানকে হত্যা করেছিল, তাঁর বিধবা পত্নীকে জোর করে নিকাহ্ করেছিল, এবং নিজেকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করেছিল। যখন রসূলে পাক (সাঃ) তার বিদ্রোহের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি মুয়াজ বিন জাবাল এবং মুসলমানদের কাছে একটি পত্র পাঠিয়ে দিলেন, এবং তাতে মুসলমানদেরকে বললেন আসওয়াদ আনাসীর বিরোধিতা করতে। পরে মুসলমানদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে আসওয়াদ আনাসী নিহত হয়। (তার মৃত্যুর সংবাদ মদীনায় পৌঁছে রসূলে পাক (সাঃ)-এর ওফাতের একদিন পরে।)৭

(ঙ) অনুরূপভাবে, লাকবীত বিন মালিক আজাদী ধর্মত্যাগ করে এবং নবী হওয়ার দাবী করে। সে জাফর এবং আবাদ নামক দু'জন কর্মকর্তাকে ওমান থেকে বহিষ্কার করে ৮। নবুওয়তের অন্যান্য দাবীদারদের মতই তারও কোন সম্পর্ক ছিল না ধর্মের সঙ্গে। তার উদ্দেশ্য ছিল গোপনে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করা। যে ইসলামিক রাষ্ট্রে সে বাস করতো, সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেছিল। সুতরাং, এক্ষেত্রে তার ধর্মত্যাগের প্রশ্নটা অবান্তর। ক্ষণিকের জন্য আমরা

যদি ধরে নিই যে, এই লোকগুলো তাদের ধর্মত্যাগ করেনি, কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাহলে তো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হতো; এবং দেশে অরাজকতা বা ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টির অপরাধের জন্য পবিত্র কোরআন যে শাস্তির বিধান দিয়েছে, তা মৃত্যুদণ্ড। এই শাস্তি ধর্মত্যাগের জন্য নয়।

(চ) ধর্ম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড – এই মতের প্রবক্তারা উম্মে কারফা-এর ঘটনাটিরও উল্লেখ করে থাকেন। উম্মে কারফা নামের এই স্ত্রী লোকটি মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর আমলে। এই স্ত্রীলোকটির তিরিশটি ছেলে ছিল। এবং সে তাদেরকে সবসময়ে উত্তেজিত করতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তাকে হত্যা করা হয় তার রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য এবং হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য। তাকে ধর্মত্যাগের জন্য কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি।[৯]

(ছ) খারিজীদের বিরুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-এর যুদ্ধের ঘটনাটিও প্রায়শঃ পেশ করা হয়। খারিজী যমীনের বুকে ফাসাদ ও অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল, মুসলিম নরনারীদেরকে হত্যা করেছিল, হযরত আলীর (রাঃ) নিযুক্ত গভর্ণরকে হত্যা করেছিল, তাঁর দাসীকে এবং তাঁর দূতকেও হত্যা করেছিল।[১০] (এই ঘটনার আলোচনা করা হয়েছে পূর্ববর্তী প্রবন্ধে)।

(জ) এই প্রসঙ্গে মুয়াজ বিন জাবাল এবং আবূ মুসা আশারীর কথাও এসে যায়। এঁরা দু'জনই ইয়েমেনের এক অংশের জন্য গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তাঁদেরকে রসূলে পাক (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ 'জনগণের জন্য সব কিছুকেই সহজ করবে, এবং তাদেরকে কোন কষ্টে ফেলবে না। তাদের সঙ্গে প্রফুল্লবদনে কথা বলবে, এবং এমনভাবে বলবে না যাতে তারা বিরক্ত হয়ে চলে যায়।' মুয়াজ একদিন এসেছিলেন আবূ মুসা আশারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, তিনি দেখতে পেলেন যে, সেখানে একটা লোক বসা অবস্থায় আছে, এবং তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুয়াজ যখন ব্যাপারটা জানতে চাইলেন, তখন তাকে বলা হলো যে, লোকটি একজন ইহুদী, সে মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে যায়। বর্ণনাকারী এর সঙ্গে আরও বলছেন যে, মুসলমানরা দু'তিন মাস ধরে লোকটাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে পুনরায় মুসলমান হওয়ার জন্য, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। মুয়াজ ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁর সওয়ারী (উট বা ঘোড়া) থেকে নামবেন না, যতক্ষণ না

লোকটাকে হত্যা করা হয়, এবং এ-ও বলেন যে, এটাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডিক্রী। তাঁর শেষের কথাটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটা ছিল তাঁর একটা ব্যক্তিগত অভিমত মাত্র, এবং এটা তিনি প্রকাশ করেছিলেন, – তিনি নিজে আল্লাহ্ ও রসূলের ইচ্ছা বলতে যা বুঝাতেন তাঁর সেই বুঝ মতো। এই জাতীয়, মতামতের কোনই মূল্য নেই আইনের চোখে, যদি না পরখ করে দেখার পর প্রমাণিত হয় যে,সেগুলো যথার্থই সঠিক ছিল। (এই নীতির উপরে একটু পরেই আরও আলোচনা করা হবে।)

এখন আমরা এই হাদীসের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা দেখেছি, রসূলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ ছিলঃ 'জনগণের জন্য সব কিছুকেই সহজ করবে, এবং তাদেরকে কোন কষ্টে ফেলবে না। তাদের সঙ্গে প্রফুল্লবদনে কথা বলবে এবং এমনভাবে কথা বলবে না, যাতে তারা বিরক্ত হয়ে চলে যায়'। কিন্তু মুয়াজের ঐ মন্তব্য ছিল রসূলে পাক (সাঃ)-এর নির্দেশের পরিপন্থী। সুতরাং, মানবাধিকারের প্রশ্ন জড়িত এমন একটা মৌলিক ইস্যুর উপরে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে মুয়াজের উপলব্ধি কতটুকু তা যাচাই না করেই তার বর্ণিত একটা হাদীসের উপরে নির্ভর করাটা নিতান্তই বাতুলতা মাত্র।

এই হাদীসটির সত্যতা সম্পর্কে নানা সন্দেহ আছে, এর বর্ণনাকারীদের পারম্পর্য এবং প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ আছে। যে হাদীস নিয়ে এই রকমের সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়। মনে রাখা দরকার যে, এই হাদীসগুলি সংগৃহীত হয়েছিল ইসলামের আর্বিভাবের প্রায় দু'তিন শতাব্দী পরে। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি কমে যায়, মানুষ ভুলে যায়। এক হাদীসে আছে ইহুদী লোকটির শিরচ্ছেদ করা হয় মুয়াজের আদেশক্রমে।[১১] অপর এক হাদীসে আছে যে, মুয়াজ নিজেই ঐ ইহুদীর শিরচ্ছেদ করেছিলেন।[১২] মূল ঘটনা নিয়েই যখন এইরূপ মৌলিক পার্থক্য, তখন এই হাদীসগুলিকে প্রামাণ্য বলে কে গ্রহণ করবে ? শোনা কথা মানুষ ভুলে যেতে পারে, কিন্তু তারা যদি ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখতো, তাহলে অন্ততঃ এতটুকু মনে রাখতে পারতো যে, আখেরে ঐ 'মুরতাদ' লোকটির কপালে কি ঘটেছিল এবং কেমন করে ঘটেছিল।

এবারে আমরা এমন একটি হাদীসের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে চাই, যার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়; এবং ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদন্ডের শাস্তির প্রবক্তা যারা, তারা এই হাদীসটির উপরেই বেশী বেশী জোর দেন এবং নির্ভর করেন। তবে, আমরা এ নিয়ে ইচ্ছে করেই শেষের দিকে আলোচনা করতে চাই, যাতে

করে এর উপরে সুবিচার করা হয় এবং বিষয়-বস্তুরও সাধারণ ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ না পড়ে।

এই হাদীসটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে এখানে সেই সমস্ত নীতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দু'চারটি কথা বলা, সম্ভবতঃ, অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যেগুলিকে গ্রহণ করে আসছেন সব যুগেই সব ইসলামী বিশেষজ্ঞরা। কখনো কখনো কোন ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের সঙ্গে হাদীসের এবং এক হাদীসের সঙ্গে অন্য হাদীসের যে আপাতঃ বিরোধ দেখা যায়, এবং তা নিয়ে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তা সবই সমাধান করা যায় এই নীতিগুলির সাহায্যে। এই নীতিগুলি হচ্ছেঃ

(১) সবকিছুর উপরে আল্লাহ্‌র কথাঃ কোরআন করীম,
(২) অতঃপর, সুন্নাহ্ঃ রসূলে পাক (সাঃ)-এর কার্যাবলী,
(৩) অতঃপর, হাদীসঃ রসূল পাক (সাঃ)-এর বাণীসমূহ।

(ক) যদি রসূলে পাক (সাঃ)-এর কোন কথার প্রামাণিকতা সন্দেহতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে মানতে হবে যে, সেই কথাগুলিকে রসূলে পাক (সাঃ)-এর মুখে দিয়েছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। পবিত্র কোরআনের কথার সঙ্গে রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি আরোপিত কথার বিরোধ না থাকলে, সেই হাদীসকে সহীহ্ বা প্রামাণিক বলে গ্রহণ করতে হবে।

(খ) এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি আরোপিত অর্থাৎ তাঁর (সাঃ) কথা বলে চালিয়ে দেওয়া কোন হাদীস যখন পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট কোন নির্দেশের বিরোধী হয়, তখন সেই হাদীসকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং তা রসূলে পাক (সাঃ)-এর কথা বলে গৃহীত হবে না।

(গ) যদি অনুরূপ কোন হাদীস পবিত্র কোরআনের কোন নির্দেশের খোলাখুলি পরিপন্থী না হয়, এবং এতদুভয়ের মধ্যে সমঝোতার অবকাশ থাকে, তাহলে হাদীসটিকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে আদর্শগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোন সামঞ্জস্য বিধান করা যায় কিনা তার জন্য একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে।

(ঘ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি আরোপিত কোন হাদীসের সঙ্গে পবিত্র কোরআনের সামঞ্জস্য খোঁজার সময় একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষাকে তথাকথিত হাদীসের খাতিরে কোনক্রমেই শিথিল করা যাবে না। তবে, সেই হাদীসের একটা ব্যাখ্যা

খোঁজার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং সন্দেহজনক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই হাদীসকে কোরআনের আলোক সম্পাতে যাচাই করতে হবে এবং সেভাবেই তার বিচার কতে হবে।

(ঙ) যদি দেখা যায় যে, পবিত্র কোরআন ও হাদীসের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই, তাহলে সেক্ষেত্রে হাদীসের বিশ্বাসযোগ্যতার মূল্যায়ণ করতে হবে সূত্রগুলির এবং বর্ণনাকারীদের পারস্পর্যের সনদের বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে।

(চ) এই শ্রেণীর হাদীসকে অন্যান্য সহীহ্ ও ব্যাপকভাবে গৃহীত হাদীসগুলির সঙ্গে মিলায়ে দেখতে হবে, যাতে করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এই হাদীসের সঙ্গে অন্য কোন হাদীসের গরমিল নেই।

(ছ) সবশেষে, কোন হাদীসের বিশ্বাসযোগ্যতা পরখ করে দেখার আর একটি নির্ভরযোগ্য উপায় হচ্ছে, সেই হাদীসের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ নিয়ে অণুপুঙ্খ গবেষণা করা। হাদীসের বিষয়বস্তু যদি রসূলে পাক (সাঃ)-এর ভাবমূর্তি–যা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চারিত্র্য ও তাঁর জীবনভর আচরণের উপরে গবেষণা থেকে – তার বিরোধী হয়, তাহলে সেই হাদীসকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কেননা, তা যেমন রসূলে পাক (সাঃ)-এর কথা নয়, তেমনি তা যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী। উল্লেখিত এই নীতিমালার আলোকে আমরা এখন আলোচ্য উক্ত হাদীসটি যাচাই ১৩ করে দেখবো (যে হাদীসটির উপরের বেশী বেশী জোর দেন এবং নির্ভর করেন মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তারা) ঃ

হাদীস

বুখারীতে সংকলিত আছে,

ইকরামা বর্ণনা করছেন যে, তিনি শুনেছেন যে, হযরত আলীর (রাঃ) সম্মুখে কয়েকজন জিন্দীককে উপস্থিত করা হলে, তিনি সেই লোকগুলোকে জীবন্ত পুড়ে মারার নির্দেশ দেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন যে, তিনি হলে (আলীর জায়গায়) এমন ধরনের হুকুম দিতেন না, কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন যে, আগুনের শাস্তি দিতে পারেন কেবল আল্লাহ্, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ বলেছেন, যে কেউ ধর্ম পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।"১৪

এই হাদীসটির বর্ণনা, কিছু কিছু তারতম্যসহ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, আল্ নেসাঈ এবং ইবনে মাজার সংকলনেও পাওয়া যেতে পারে।

পবিত্র কোরআনের সঙ্গে এই হাদীসের পরস্পর বিরোধিতাঃ

কোন স্বচ্ছ মনের মানুষের পক্ষেই কোরআন করীমের নিম্নোল্লেখিত আয়াতগুলির সঙ্গে এই হাদীসটির খাপ খাওয়ানো সম্ভব হবে না।

২ ঃ ৫৭, ১০০, ১০৯, ২১৮, ২৫৭, ২৭৩

৩ ঃ ২১, ৭৩, ৮৬–৯২, ১৪৫

৪ঃ ৮৩, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৬

৫ ঃ ৫৫, ৬২, ৯১–৩, ৯৯, ১০০

৬ ঃ ৬৭, ১০৫–৮, ১২৬

৭ ঃ ১২৪–৯

৯ ঃ ১১–১৪

১০ ঃ ১০০–৯

১৩ ঃ ৪১

১৫ ঃ ১০

১৬ ঃ ৮৩, ১০৫–৭, ১২৬

১৭ ঃ ৫৫

১৮ ঃ ৩০

১৯ ঃ ৪৭

২০ ঃ ৭২–৭৪

২২ ঃ ৪০

২৪ ঃ ৫৫

২৫ ঃ ৪২–৪,

২৬ ঃ ১১৭

২৮ ঃ ৫৭

২৯ ঃ ১৯

৩৯ ঃ ৩০–৪২

৪০ ঃ ২৬, ২৭

৪২ ঃ ৭, ৮, ৪৮, ৪৯

৪৭ ঃ ২ ৬

৫০ ঃ ৪৬

৫১ ঃ ৫৭

৬৪ ঃ ৯–১৩

৬৬ ঃ ৭

৮৮ ঃ ২২, ২৩

এই আয়াতগুলির মধ্য থেকে এবং পূর্বে উদ্ধৃত কিছু কিছু আয়াতেরও বিশেষ নমুনা স্বরূপ নিম্নের এই পরিচ্ছেদটি আগে পাঠ করুন ঃ

> "এবং যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তা তার নিকট থেকে কখনও কবুল করা হবে না, এবং পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
>
> কেমন করে আল্লাহ্ সেই জাতিকে হেদায়াত দিবেন যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই রসূল সত্য

এবং তাদের প্রতি সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ এসেছে ? বস্তুতঃ তিনি যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না।

এরা এমন লোক যাদের প্রতিফল এই যে, তাদের উপরে আল্লাহ্ এবং ফেরেশ্‌তারা এবং সমগ্র মানবজাতির লানত (অভিসম্পাৎ)।

তারা ওতে দীর্ঘকাল ধরে থাকবে,তাদের উপর থেকে শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

তবে, ঐ সকল লোক ব্যতীত যারা অতঃপর তওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে তাদের ঈমান আনার পর, তারপর অস্বীকারে আরও বেড়ে গেছে, তাদের তওবা আদৌ কবুল করা হবে না; বস্তুতঃ তারাই পথভ্রষ্ট।

নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে এবং কাফের থাকা অবস্থায় মারা গেছে, তাদের কারো নিকট থেকে পৃথিবী-ভরা স্বর্ণও কবুল করা হবে না, যদিও তা মুক্তিপণ হিসেবে পেশ করে। এরাই এমন যাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না। (আলে ইমরান ঃ ৮৬-৯২)

এই আয়াতগুলি থেকে সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, কোন মানুষ অপর কোন মানুষকে ধর্ম পরিত্যাগের জন্য কোন শাস্তি দিতে পারে না। 'তারা ওতে দীর্ঘকাল ধরে থাকবে' কথাগুলি দ্বারা পরিষ্কারভাবে পরকালের জীবনকে বুঝানো হয়েছে। 'আল্লাহ্‌র লানত (অভিসম্পাৎ)' এর ব্যাখ্যায় কোন সুস্থবুদ্ধির মানুষ এটা কল্পনাও করতে পারে না যে, এর দ্বারা 'মুরতাদ' বলে বিবেচিত কোন মানুষকে হত্যা করবার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের কোনও উল্লেখই করা হয়নি এখানে। যদি তা-ই হতো তাহলে, আইনের অবশ্যপূরণীয় শর্ত হিসেবে শাস্তিকে অবশ্যই পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা হতো, যেমনটি করা হয়েছে অন্য সমস্ত 'হুদূদ' (পবিত্র কোরআনে প্রদত্ত বিভিন্ন শাস্তির বিধান)-এর ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে, পবিত্র কোরআন ঐ সকল লোকের পক্ষে তওবা (অনুতাপ) করার এবং তার ফলে, খোদাতা'লার কাছে তাদের ক্ষমা প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা বলেছে। কাউকে যদি হত্যাই করা হয়, তাহলে সে কি করে তওবা করবে এবং এই পৃথিবীতে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে ?

ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড – এই মতের প্রবক্তাদের এটা বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, তাদের সমর্থনে উল্লেখিত ঐ হাদীসটি যদি 'সহীহ' বলেই ধারণা করা হয়, তাহলে এই হাদীসের সঙ্গে কোরআন মজীদের যে প্রত্যক্ষ বিরোধ, তার

ফয়সালা হবে কী করে। বিশেষ করে, উপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহের আলোকে তাদের উচিত তাদের মতটাকে পুনরায় বিবেচনা করে দেখা এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে সেগুলির উপরে আবারও বিচার–বিশ্লেষণ করা। কোরআন করীমের এই সমস্ত সুস্পষ্ট নির্দেশের চাইতে একটা সন্দেহজনক হাদীসের উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা কি কারো পক্ষে সম্ভব ? কোরআন করীমে তো বলা হয়েছেঃ

"যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন তাহলে, ভূ-পৃষ্ঠে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনতো। সুতরাং তুমি কি লোকদেরকে বাধ্য করবে যে পর্যন্ত না তারা মুমিন হয় ?

এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি ঈমান আনতে পারে না। এবং তিনি তার কোপ তাদের উপরে বর্ষণ করেন যারা বুদ্ধি খাটায় না।" (ইউনুসঃ ১০০–১)।

খোদা যখন নিজেই ঈমান আনার জন্য মানুষের উপরে জোর খাটান না, তখন আমরা কে যে ঈমান আনার জন্য মানুষের উপরে তরবারি উঠাব অথবা মওদুদীর ইঁদুর-মারা-ফাঁদ পাতবো? ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তাদের সমস্যা হচ্ছে, তারা রসূলে পাক (সাঃ)–এর শত শত বৎসর পরে সংকলিত হাদীসগুলোকেও আক্ষরিকভাবেই গ্রহণ করে থাকেন, যেগুলো কিনা বোধগম্য কারণেই পবিত্র কোরআনের শিক্ষার পরিপন্থী।

'সুন্নাহ্'র সঙ্গে বিরোধ

শারীয়াহ্ বা আইনের জন্য আমাদের দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর চরিত্র এবং তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত। ধর্মত্যাগের জন্য কখনও কাউকে মৃত্যুদণ্ড দান করা হয়েছে বলে যে দাবীটা, আমরা তার অন্তঃসার শূন্যতা ইতোমধ্যেই প্রমাণ করে দেখিয়েছি।

আর যা-ই হোক, প্রশ্ন হচ্ছে–মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অবস্থান কি ছিল? তা ছিল এটাই যে, তাঁকে শান্তির সঙ্গে আল্লাহ্‌র বাণী প্রকাশ ও প্রচার করতে দিতে হবে। মক্কাবাসীরা তাঁকে এই স্বাধীনতা দেয় নি, এবং তাকে যারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, তাদেরকে শাস্তি দিচ্ছিল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাণীর উপরে যারা ঈমান এনেছিল, তারা মক্কাবাসীদের চোখে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী ছিল, কেননা, এরা তাদের পৌত্তলিকতার ধর্মকে পরিত্যাগ করেছিল।

হযরত রসূলে পাক (সাঃ) জীবনভর এই মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার্থে সংগ্রাম করে গেছেন যে, প্রত্যেককেই স্বাধীনভাবে তার ধর্ম পসন্দ করার ও গ্রহণ করার অধিকার দিতে হবে। কেউ জবরদস্তি করে অন্য কাউকে ধর্ম পরিবর্তন

করতে বাধ্য করতে পারবে না এবং প্রত্যেকেরই এই অধিকার থাকবে যে, সে চাইলে তার ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবে, তা সে ধর্ম যা–ই হোক না কেন। বস্তুতঃ, এটাই হচ্ছে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধের প্রকৃত অর্থ; এবং এই জেহাদই চালিয়ে গেছেন খোদার নবীরা বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে ধর্মের সারাটা ইতিহাসে। পবিত্র কোরআন বার বার এর উল্লেখ করেছে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রসঙ্গে। (দেখুন –২ঃ৫; ৬ঃ১১৩; ২১ঃ৪২; ২৫ঃ৩২; ৩৬ঃ৮, ৩১; ৪৩ঃ৮) এঁদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেনঃ হযরত ইব্রাহীম –আঃ– (৬ঃ৭৫–৯; ১৯ঃ৪৭; ২১ঃ৫৩, ৫৯, ৬১, ৬৯, ৭০; ৩৭ঃ৮৯–৯১, ৯৮); ইলিয়াস – আঃ– (৩৭ঃ১২৬–৭); লূত –আঃ- (২৬ঃ১৬৬–৮; ২৭ঃ৫৭; ১৫ঃ৭১); নূহ্–আঃ - (৭ঃ৬০; ১০ঃ৭২; ১১ঃ২৬–৭; ২৬ঃ১১৭' ৭১ঃ২–২১); মূসা–আঃ - (৭ঃ১০৫–৬; ১২৪–৭; ১০ঃ৭৬–৯; ১৭ঃ১০২–৩; ২০ঃ৪৪–৫; ৫০–৩; ২৬ঃ ১৯–৩৪);এবং ঈসা –আঃ - (৩ঃ৫২–৬; ৫ঃ১১৮; ১৯ঃ৩৭; ৪৩ঃ৬৫)। তাঁরা (আঃ) কিসের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন? তাঁরা তো শুধু বিরুদ্ধবাদীদের এই দাবীটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন যে, তাঁদের (আঃ) কোন অধিকার নেই সমসাময়িক লোকদের ধর্ম পরিবর্তন করার। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকেরই অধিকার আছে তার ধর্ম পসন্দ করে গ্রহণ করবার। যতক্ষণ পর্যন্ত শান্তি ও প্রেমের বাণী শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচারিত হতে থাকবে, ততক্ষণ তা বল প্রয়োগে প্রতিহত করবার অধিকার কারো নেই। সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও মানবিক এই নীতির বিপক্ষে বিরুদ্ধবাদীদের একগুঁয়ে প্রতিক্রিয়া এটাই ছিল যে, তারা নবীগণের (আঃ) ঐ মহৎ দৃষ্টিভঙ্গিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের সেই দাবীতেই অটল ছিল যে, তাদের জনগণের ধর্ম পরিবর্তন করার কোনও অধিকার নেই নবীদের। এথেকে বিরত না হলে নবীদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে ধর্মত্যাগের জন্য শাস্তি গ্রহণ করতে, এবং তা হচ্ছে (বিরুদ্ধবাদীদের মতানুসারে) মৃত্যু অথবা নির্বাসন।

বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে নবী করীম (সাঃ)–এর সংগ্রাম ছিল পূর্ববর্তী সকল নবী–রসূলদের সুন্নতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। রসূলে করীম (সাঃ)–এর সারা জীবনের এই মিশনকে কি করে কোন কোন সুস্থ্-বুদ্ধির মানুষের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব ? এবং কি করে সম্ভব তাঁর (সাঃ) এই মৌলিক নীতির অবিচল মহৎ মনোভঙ্গীকে চ্যালেঞ্জ করা ? পবিত্র কোরআন, রসূলে পাক (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ এবং অন্যান্য হাদীসে ভুরিভুরি প্রমাণ মিলে আলোচ্য ঐ হাদীসটির বিপক্ষে। এই হাদীসটির অবিশ্বস্ততাকে কেউকে খাটো করে দেখতে পারবেন না।

সূত্র এবং বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা

প্রথমলব্ধ ধারণার ভিত্তিতে (Prima facie), এখানে নাকচ করা, হাদীসটি প্রমাণিকরূপেই গৃহীত হয়েছে বিখ্যাত সংকলনকারীদের দ্বারা যেমন, বুখারী,

তিরমিযী, আবূ দাউদ, আন্–নেসাঈ এবং ইবনে মাজার দ্বারা। এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সাধারণভাবে গৃহীত ছয়টি সংকলনের পাঁচটিতেই। কিন্তু এর মধ্যেই সীমিত এর প্রামাণিকতা।

এটা হাদীসকে প্রামাণিক বলে ঘোষণা দেওয়ার পক্ষে শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, তা প্রামাণিক সংকলনগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরও কিছু প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড রয়েছে যা প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হচ্ছে, বর্ণনার সূত্রের ধারাবাহিক শৃঙ্খলের মধ্যেকার সংযোগকারী বর্ণনাকারীদের খ্যাতি ও চরিত্রকে গভীরভাবে ও পুংখ্যাণুপুংখরূপে পরীক্ষা করে দেখা।

এমন বহু বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁরা সারা জীবন ধরে এই গবেষণা করেছেন। তাঁদের অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এই অণুপুংখ অনুসন্ধানের জন্য তাঁদেরকে জানাই শুকরিয়া। তাঁদের এই দুরূহ সাধনার ফলেই আজ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, প্রতিটি সংকলনের প্রত্যেকটি হাদীসের ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের শৃংখলের প্রত্যেকটি সংযোগকে পরীক্ষা করে দেখা।

এখন আমরা আমাদের আলোচ্য হাদীসটির দিকে দৃষ্টি ফেরাবো। এই হাদীসটি 'আহাদ গারীব' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এটি এমন হাদীস যার বর্ণনাকারীদের শৃংখল একটাই এবং যার সূত্রও একই। কেননা, পাঁচটি সংকলনেই এই হাদীসটির বর্ণনাকারীদের যে শৃংখল দেখানো হয়েছে তার মূল সূত্র একই, এবং সূত্র হচ্ছেন–ইকরামা। মরহুম মওলানা আব্দুল হাই (লখ্নৌ) বিশেষভাবে ইকরামার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এবং সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, বুখারী যেহেতু ইকরামাকে তাঁর সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেহেতু বাকী সবাই স্বতন্ত্রভাবে আর কোন অনুসন্ধান না করেই তা–ই অনুসরণ করেছেন। ১৫

কোন হাদীস যদি একটিমাত্র ধারাবাহিক শৃংখলের বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত না-ও হয় তবু, তা যে প্রামাণিক ও বিশ্বস্ত হবে না, এমন কথা বলা যায় না। পক্ষান্তরে, কোন হাদীস একাধিক ধারাবাহিক শৃংখলের বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত হলেই যে প্রামাণিক ও বিশ্বস্ত হবে, তা-ও বলা যাবে না। এই শ্রেণীর হাদীসের দ্বারা অধিকার, দায়িত্ব ও শাস্তি সম্পর্কিত রায় বা ফতওয়াকে প্রভাবিত করবার অনুমতি নেই। বিশেষ করে, 'হুদূদ'-এর ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। 'হুদূদ' কথাটি কেবলমাত্র সেই সমস্ত শাস্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে, যার বিধান নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে

কোরআন করীমে। ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড – এই ধারণার সমর্থকরা মনে করেন যে, তাদের মতের ভিত্তি হচ্ছে সেই সমস্ত কোরআনী নির্দেশাবলী যা 'হুদূদ'-এর আওতাভুক্ত। কিন্তু, তাদের এই দাবীটা যে আদৌ ভুল, তা আমরা প্রমাণ করে এসেছি।

এটা মনে রাখা খুবই জরুরী যে, আলোচ্য হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে একটি মাত্র শৃংখলের বর্ণনাকারীদের দ্বারা। অতএব, কেউ যদি এটিকে 'সহীহ্' বলেও ধরে নেন, তবু এর কোনও ব্যবহার–শাস্ত্র বা ফেকাহ্ নেই। এই প্রেক্ষিতে, ইকরামার পরিচিতি ও খ্যাতি সম্পর্কে আরও বেশী কিছু জানার প্রয়োজন রয়েছে।

ইকরামা

ইকরামা[১৬] ছিল ইব্‌নে আব্বাসের একজন ক্রীতদাস ও ছাত্র,–অত্যন্ত অমনোযোগী ছাত্র, এবং সেজন্যই, বলা যায়, একজন পাকা–পোক্তরূপেই পিছনের সারির ছাত্র। ব্যাপারটা সে নিজেই পাকা বা কনফার্ম করেছে এই বলে যে, লেখাপড়ায় অনীহার কারণে তার উপরে দারুণ রাগ ছিল ইবনে আব্বাসের এবং তিনি রাগের চোটে তার হাত–পা বেঁধে রাখতেন যাতে পাঠদান কালে সে পালাতে না পারে।[১৭]

সে ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর (রাঃ) একজন বিরোধী ছিল এবং খারিজীদের পক্ষে ছিল, বিশেষ করে সেই সময়টাতে যখন হযরত আলী ও ইব্‌নে আব্বাসের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। পরে, আব্বাসীয় আমলে, (স্মর্তব্য যে, আব্বাসীয়রা সকলের প্রতিই শত্রুভাবাপন্ন ছিল), ইকরামা একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুখ্যাতি ও সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। স্পষ্টতঃই, এর কারণ ছিল, হযরত আলীর (রাঃ) প্রতি তার শত্রুতা এবং খারিজীদের প্রতি তার মিত্রতা।[১৮]

জাহবী বলেছেন যে, ইকরামা যেহেতু, একজন খারিজী ছিল, সেহেতু তার হাদীসগুলিও ছিল অবিশ্বস্ত এবং সন্দেহজনক। ধর্মত্যাগের শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ইমাম আলী বিন আল্ মাদায়নীও একই অভিমত পোষণ করতেন। ইয়াহ্ইয়া বিন বাকের বলতেন যে, মিশর, আলজেরিয়া ও মরোক্কোর খারিজীদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল ইকরামা।

সাধারণভাবে, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে যে, ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড দানের হাদীসগুলির উদ্ভব ঘটেছে মূলতঃ, বসরা, কুফা এবং ইয়েমেনের ঘটনাবলী থেকে। হেজাজের (মক্কার ও মদীনার) জনগণ এগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে

অপরিজ্ঞাত ছিলেন। এ ব্যাপারে কারো পক্ষেই চোখ বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয় যে, ইকরামা বর্ণিত আলোচ্য এই হাদীসটিকে বলা হয়, একটি ইরাকী হাদীস। মনে রাখা দরকার যে, বিখ্যাত মক্কী ইমাম তাউস বিন কাইসান বলতেন যে, ইরাকী হাদীসগুলি, সাধারণভাবে সবটাই সন্দেহজনক।[১৯]

এটাই সবটা নয়। একজন প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল্ আনসারী ইকরামাকে তার অবিশ্বস্ততার জন্য কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন, এমনকি, তিনি ইকরামাকে 'কায্যাব' (মিথ্যাবাদী) পর্যন্ত বলেছেন।[২০]

আব্দুল্লাহ্ বিন্ আল্-হারিস একবার আলী বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বচক্ষে দেখা তখনকার একটা মজাদার ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি সেখানে দেখতে পেলেন যে, আলী বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাসের দরজার একটা খুঁটির সাথে ইকরামাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। এটা দেখে তিনি মনে খুব কষ্ট পেলেন এবং শংকিত হলেন। তিনি আলী বিন্ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাসের কাছে তাঁর এই নিষ্ঠুরতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে, তাঁর মনে কি খোদারও ভয় নেই! স্পষ্টতঃই, তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন, তা হচ্ছে, ইকরামা তো একজন খ্যাতিমান ও ধর্মভীরু লোক, সে তো কোনমতেই তার মৃত মালিকের আপন ছেলের হাতে এত লাঞ্ছনাময় ও নির্মম শাস্তি পেতে পারে না। এর উত্তরে আলী বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস তাঁর এই শাস্তি দানের সমর্থনে বলেছিলেন যে, ইকরামার এত স্পর্ধা যে, সে তাঁর মরহুম পিতা ইবনে আব্বাসের নামে মিথ্যা কথা ছড়াতো।[২১] ইকরামার চরিত্রের উপরে রায় দেওয়ার জন্য আলী বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাসের চাইতে ভাল বিচারক তখন আর কে ছিলেন? সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, ইমাম মালিক বিন আব্বাস-রহঃ-(হিঃ ৯৫-১৭৯) যিনি ছিলেন হাদীসের অগ্রবর্তী এক সংকলনকারী এবং ফিকাহ্ বা আইনশাস্ত্রের একজন ইমাম এবং সমগ্র মুসলিম জাহানে যাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান করা হয়--তিনি স্বয়ং ইকরামার বর্ণিত হাদীসগুলিকে অবিশ্বাসযোগ্য বলে রায় দিয়ে গেছেন।[২২]

ইকরামার কথা বাড়িয়ে বলার বা অতিরঞ্জিত করার দারুণ বদভ্যাস ছিল বলে ঘোষণা দিয়ে গেছেন স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল্ আনসারী, আলী বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস এবং আতা বিন আবি রাবাই।[২৩]

অতএব, এই-ই তো হচ্ছে সেই লোক, যার কথা বলতে হচ্ছে আমাদেরকে, –যার একক অথরিটির উপরেই, কেয়ামত তক, নির্ভর করছে–সেই সমস্ত তামাম লোকের বাঁচা ও মরা, যারা তাদের ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তন করেছে।

ইব্‌নে আব্বাস

হাদীসের বর্ণনাকারীদের শৃংখলের মাথায় যখনই ইবনে আব্বাসের[২৪] নাম দেখেন তখনই মুসলিম বিশেষজ্ঞদের প্রায় সবাই অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁরা এই সত্যটা ভুলে যান যে, তাঁর নাম ও সুখ্যাতির কারণে, মিথ্যা হাদীস রচনাকারীরা তাদের বানোয়াট বর্ণনাকারীদের শৃংখলের মাথায় তাঁর নাম জুড়ে দিত। সুতরাং, ইব্‌নে আব্বাসের নাম সম্বলিত হাদীসগুলিকে ভালভাবে বিচার ও পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

তদুপরি, কোন বর্ণনাকারী যদি সততার সঙ্গেই ইবনে আব্বাসের নাম উল্লেখ করে থাকেনও, এবং ইব্‌নে আব্বাস তেমন কিছু বলে থাকলেও ইকরামার অংশটা সম্পর্কে মানবীয় ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনাকে নাকচ করা যায় না। এ ব্যাপারে, নিম্নের উদাহরণটি লক্ষ্যণীয়ঃ

> 'ইবনে আব্বাস বলেছেন যে, উমর বলতেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন যে, মৃতের জন্য কান্নাকাটি করলে মৃতের শাস্তি হয়। ইবনে আব্বাস আরও বলেছেন যে, উমর মারা গেলে পর তিনি এই হাদীসটি আয়েশার (রাঃ) কাছে বর্ণনা করেন, এতে আয়েশা বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ উমরকে মাফ করুন। আল্লাহ্‌র কসম, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এ রকম কিছুই বলেননি। তিনি শুধু বলেছিলেন যে, কোন অবিশ্বাসী ব্যক্তির লাশের উপরে যদি তার বংশধররা কান্নাকাটি করে, তাহলে তাদের এই কাজের দ্বারা তার শাস্তিকেই বৃদ্ধি করা হবে। এবং এইসঙ্গে যুক্তির আকারে আয়েশা আরো বলেছিলেন 'কোরআনের কথাই আমাদের জন্য যথেষ্টঃ 'নিশ্চয়, কোন আত্মা অপর কোন আত্মার বোঝা বহন করতে পারবে না'।[২৫]
>
> যদি, হযরত উমর (রাঃ)-এর মত মাকাম ও মর্যাদার এক ব্যক্তিও রসূলে পাক (সাঃ)-এরও কথা বুঝতে ভুল করে থাকেন, তা সেরূপ ঘটনা যতই বিরল হোক না কেন, তাহলে সাধারণ বর্ণনাকারীদের পক্ষে ইবনে আব্বাসের বর্ণনা বুঝতে কত যে ভুল করা সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়।

ইসলামের পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর বাণীকেই বুঝতে যেখানে ভুল করার আংশকা বিদ্যমান, সেখানে কী করে কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ শুধুমাত্র এই হাদীসটিকে প্রমাণস্বরূপ খাড়া করে এমন একটি সুদূরপ্রসারী গুরুত্ববহ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, যা মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্ন এবং মৌলিক মানবাধিকারের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত?

কাজেই, এটাই সম্ভব যে, হাদীসটি ইকরামার নিজেরই বানানো, এবং সে তা চালিয়ে দিয়েছিল ইবনে আব্বাসের নামে। এবং এমন বদভ্যাস যে তার ছিল, তা বলে গেছেন স্বয়ং আলী বিন্ ইবনে আব্বাস।

অন্যান্য অভ্যন্তরীণ মানদণ্ড

আমরা যদি আলোচ্য হাদীসটির বিষয়-বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এর বক্তব্য বিষয় নানা দিকে বিভ্রান্তিকরঃ

(ক) হযরত আলীর (রাঃ) মত মাকাম ও মর্যাদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে এই ধারণাটা দেওয়া হচ্ছে যে, তিনি জানতেনই না যে, কোন ব্যক্তিকে আগুনে পুড়ে মারার শাস্তি দিতে ইসলাম সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধ করেছে;

(খ) 'যে কেউ ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর'–কথাগুলির পরিসর এত ব্যাপক যে, এগুলিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এগুলি, নারী, পুরুষ, ছেলেমেয়ে সকলের প্রতিই প্রযোজ্য হতে পারে। অথচ, ইমাম আবূ হানিফার (রহঃ) মতে এবং ব্যবহার শাস্ত্রের অন্যান্য অনেক ফের্কার মতেও, ধর্মত্যাগী কোন নারীকে হত্যা করা যাবে না।

(গ) এই হাদীসে ব্যবহৃত 'দীন' (ধর্ম) শব্দটি একটি সাধারণ অর্থাৎ ব্যতিক্রমহীন শব্দ, এর দ্বারা যে কোন ধর্ম বোঝায়, নির্দিষ্টভাবে শুধু ইসলাম নয়। এমনকি, পৌত্তলিকদের ধর্মকেও 'দীন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরা আল্ কাফেরুন)।

হাদীসটিতে ব্যবহৃত ভাষার সাধারণ প্রযোজ্যতার আলোকে, কি করে এর প্রয়োগ শুধু ধর্মত্যাগী মুসলমানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে? আইন যথার্থরূপে কার্যকর করতে হলে, এই হাদীস অনুসারে যে কোন ব্যক্তি তার ধর্ম পরিত্যাগ করলে, তা সে ধর্ম যা-ই হোক না কেন, – তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এর অর্থ হবে, ইহুদী যদি খৃষ্টান হয়, তাকে হত্যা করতে হবে, খৃষ্টান মুসলমান হলে তাকে হত্যা করতে হবে, প্রকৃতি উপাসক বা পৌত্তলিক কোন নতুন ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করতে হবে। 'যে কেউ' কথাটা মুসলিম রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমানাকেও অতিক্রম করে যাবে, তখন তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, এই পৃথিবীটার যে কোন স্থানে, যে কোন ব্যক্তি যদি তার ধর্ম পরিবর্তন করে–তা সেই ব্যক্তি অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী হোক, আফ্রিকার পিগ্মী হোক অথবা দক্ষিণ আমেরিকার কোন ভারতীয় হোক – তাকে অবশ্যই সেই মুহূর্তেই হত্যা করতে হবে, যে মুহূর্তে সে তার পূর্বের ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন কোন ধর্ম গ্রহণ করবে।

ইসলাম ধর্মান্তরিত করণের উপরে খুব বেশী জোর দেয়। । অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের উপর এটা বাধ্যকর যে, সে আল্লাহ্‌র পথে একজন প্রচারক হবে। সুতরাং, এটা কত বড় একটা পরিহাস যে, আজকাল বহু বিখ্যাত মুসলিম উলেমা ইসলামী জেহাদের মূল তাৎপর্যকেই নস্যাৎ করে দিচ্ছে, কেননা, তারা এই সংকীর্ণমনা ভ্রান্ত মতের অনুসরণ করছে এবং স্পর্ধাভরেই করছে যে, ইসলাম নির্দেশ দেয়, যে কেউ তার ধর্ম পরিহার করলে, –এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে–ইসলামকেই বোঝানো হয়,–তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে হবে। তাহলে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বেলায় কি হবে?

ইসলাম ঘোষণা করে, মুসলমানদের জন্য এটা বাধ্যকর যে, তারা তাদের চারপাশের অমুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত করার মহান ব্রতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে, এবং সেই লক্ষ্যে সব সময় শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এই দায়িত্ব এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এত প্রয়োজনীয় যে, তা পালন করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে আমরণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

> "তুমি হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সঙ্গে এমন পন্থায় বিতর্ক কর যা সব চাইতে উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু–প্রতিপালক তাদেরকে সর্বাধিক জানেন যারা তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে; এবং তিনি তাদেরকেও সর্বাধিক জানেন যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।" (আন্-নহল, ১৬ঃ১২৬)

ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড,–এই ধর্মান্ধ ও অমানবিক মতবাদের প্রবক্তারা এটা কল্পনাও করতে পারে না যে, আন্তর্জাতিক ও আন্তঃধর্মীয় মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের এই মতবাদের প্রভাব ও ফলাফল কী হতে পারে। তারা কেন এটা দেখতে পায় না যে, তাদের ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, এতে করে অন্যান্য সকল ধর্মের অনুসারীদের তো ধর্ম পরিবর্তন করবার অধিকার থাকবে বটে, কিন্তু মুসলমানদের সেই অধিকার থাকবে না; এবং অন্যান্য সকলকেই ধর্মান্তরিত করবার একক অধিকার (Prerogative) কেবল ইসলামেরই থাকবে; কিন্তু অপরাপর ধর্মাবলম্বীরা মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে ? ইসলামী সুবিচারের কত নিকৃষ্ট এই দৃশ্য, যা তারা উপস্থাপিত করছেন!

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে,

ধর্মত্যাগ (ইরতেদাদঃ Apostasy) হচ্ছে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার পূর্ববর্তী ধর্মকে পরিষ্কারভাবে বর্জন করা।

মতাদর্শগত পার্থক্য, তা যত গভীরই হোক না কেন, তা কখনই ধর্মত্যাগ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

ধর্মত্যাগের শাস্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র হাতেই ন্যস্ত, এ অপরাধ তাঁর বিরুদ্ধেই করা হয়।

ধর্মত্যাগ যদি অন্য কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে বেড়ে না যায়, তাহলে তা এই পৃথিবীতে শাস্তিযোগ্য হবে না।

এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র শিক্ষা।

এটাই ছিল রসূলে পাক (সাঃ)-এর শিক্ষা।

এই অভিমতকেই পাকা বা কনফার্ম করেছেন হানাফী আইন বিশারদরা,২৬ ফতেহ্ আল্‌–কাদির,২৭ চালপি,২৮ হাফিয ইবনে কাইয়েম, ইব্রাহীম নাখাই, সুফিয়ান সৌরি এবং আরো অনেকেই।

মওদুদীয়ানদের যে দাবী, তাদের সেই হাদীসটির 'সহীহ্' হওয়া সম্পর্কে,–তা স্রেফ একটা কল্পিত কাহিনী মাত্র।

টীকাসমূহ

১. কথাটি ব্যবহৃত হয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের চারজন পর পর স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী অর্থাৎ খলীফার জন্য; এঁরা হলেন হযরত আবূবকর রাজি আল্লাহু তা'লা আনহু, হযরত উমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)–এঁদের শাসনামল ৬৩২ –৬৬১ খৃষ্টাব্দ।

২. ভাষ্য বা তফ্‌সীরঃ বাহরুল মুহীত খন্ড ২, পৃঃ ৪৯৩।

৩. তাবারী, খঃ ৪, ১৮৭৩; ইবনে খলদুন, খঃ ২, ৬৫; খামীস, খ. ২, ২৩৭ ইত্যাদি।

৪. তাবারী, খ. ৪. ১৮৪৯।

৫. খামীস, খ. ২, ৬৪১।

৬. ইবনে হিযর আল্ আসকালানী, আল – ইসাবা ফি তামীজিস্ শোহাদা (বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল–আরাবী) খ. ২, ৪৪৮; আল ইমাম আল্লামা ইবনুল আছির, উসুদুল গাবা ফি মারেফাতুল সাহাবা (বৈরুতঃ দার আহ্ইয়াউল তারাস আল–আরাবী) খ. ৪, ৩।

৭. ইবনুল আছির আল যায্‌রী, আল কামিল ফিল তারিখ (বৈরুতঃ দারুল কুতব আল আলমিয়া), খ. ২, ২০১–৫।

৮. তাবারী, খ. ৪, ১৯৭৭।

৯. মাসবুত, খ. ১০, ১১০।

১০. ফাত্‌হ – আল-বারী, খ. ১২, ২৬৭; ইমাম রাযী: তফ্‌সীর কবীর, খ. ৩, ৬১৪; শেখ ইবনে তাইমিয়া: মিনহাজুস সুন্নাহ্‌ খ, ২, ৬১–২; তারিখ আল – কামিল, খ. ৩, ১৪৮।

১১. বুখারী, কিতাবুল মুস্‌তাদীন ওয়াশ মুখানাদ্বীন ওয়া কিতালেহিন, বাব হুকুমুল মুরতাদ ওয়াল মুরতাদ্দা।

১২. আবু দাউদ।

১৩. পবিত্র কোনআনের নিদের্শঃ 'যখন তোমরা এই কথা শুনেছিলে মুমিনগণ এবং মুমিনাগণ কেন নিজেদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা করেনি এবং বলেনি, 'ইহা ডাহা মিথ্যা ?' ....(২৪ঃ১৩) হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেনঃ 'কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার পক্ষে এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, সে যা কিছু শোনে তা যাচাই না করেই বলে বেড়ায়।' (মুসলিম, খ. ১, –হাদীস সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত অধ্যায়)।

১৪. বুখারী (আরবী – ইংরেজী সংস্করণ), খ. ৯, কেতাব (Book) ৮৪, অধ্যায় ২, হাদীস নং ৫৭, পৃঃ ৪৫ (দারুল আরাবিয়া, বৈরুত, ১৯৮৫)।

১৫. আব্দুল হাই, আল রাফে ওয়াল তাকমীল।

১৬. ইকরামা বিন আবূ জাহল নয়।

১৭. ইবনে সা'দ, আল্‌ তাবকা আল কবীর, খ. ২, ৩৮৬।

১৮. মিজান আল আইতাদাল, খ. ২, ২০৮।

১৯. আবূ দাউদ, খ. ২, ৩৫।

২০. আবূ জাফর মুহাম্মদ আমর বিন মূসা বিন্‌ হামাদ আল আকবলি আল মুল্‌কী, কিতাব আল সোয়াফা আল্‌–কবীর (লেবাননঃ দারুন কুতুব আল্‌ আল্‌মিয়াহ). আল্‌ সফর ৩, ১৯৮৩, ৩৭৩।

২১. আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আমর বিন মূসা, বিন্‌ হামাদ আল্‌ আকবলি আল মুনাকী, উদ্ধৃত।

২২. মিজান আল – আইতাদাল, খ. ২, ২০৯।

২৩. ফত্‌হ আল – বারী

২৪. রসূলে পাক (সাঃ)–এর একজন চাচা আব্বাসের পুত্র। রসূলে পাক (সাঃ)–এর সময়ে আব্বাসের পুত্র একজন শিশুই ছিলেন, বলা যায়।

২৫. বুখারী, কিতাব আল্‌–জানায়েয, অধ্যায়, মৃতের জন্য কান্না।

২৬. হেদায়াহ্‌।

২৭. ফত্‌হ আল্‌ –কাদির, খ. ৪, ৩৮৯; খ. ২, ৫৮০।

২৮. চালপি, তফসীরঃ ফত্‌হ আল্‌ – কাদির, ৩৮৮; ইনায়াহ্‌, ৩৯০।

'রহ্মতুল্লিল 'আলামীন'

(জগতসমূহের মঙ্গল ও কৃপা)

'তারা এটা বুঝবার মত যথেষ্ট চালাক ছিল যে, রসূলে পাকের (সাঃ) প্রতি প্রকৃত অথবা কল্পিত কোন প্রকারের কোন অপমান আরোপ করা হলে মুসলমানদের অনুভূতি যত সহজে উত্তেজিত হয়ে উঠে তত আর কোন কিছুতেই হয় না। সুতরাং, তারা প্রচার করা শুরু করে দিল যে, তাদের সমস্ত কর্মতৎপরতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূলে পাকের (সাঃ) নবুওয়তকে রক্ষা করা এবং তাঁর 'নমুস' (সম্মান)-এর উপরে আক্রমণকে প্রতিহত করা। তাদের এই চালাকীটা খুব কাজে এলো, এবং তাদের সভা সম্মেলনগুলোতে বিপুল সংখ্যক শ্রোতার সমাগম ঘটতে লাগলো। 'আহরার'দের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক বক্তা আছে যারা বাক্ পটুতায়, উপমা-অলংকার প্রয়োগে এবং হাস্য-কৌতুকের অবতারণায় তা সে যতই ইতর ও নিম্নস্তরের হোক না কেন অত্যন্ত দক্ষ; কাজেই তাদের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে লাগলো।'

–বিচারপতি মুহম্মদ মুনীর[১]

আল্লাহ্‌র কোন নবীকে অবমাননা করার ব্যাপারটা স্বয়ং 'নবুওয়তের' মতই প্রাচীন। এমনকি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামও এথেকে নিস্তার পাননি। তাঁকে শুধু তাঁর মক্কার জীবনেই উপহাস-বিদ্রূপ করা হয় নি, মদীনার জীবনেও করা হয়েছিল যখন তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ছিল শাস্তি দান করবার। মদীনার ইহুদীদের জিহ্বার ধার ছিল দারুণ চোখা, তাদের রসবোধও ছিল অতিশয় ইতর, এবং নবী করীম (সাঃ)কে বিদ্রূপ করবার কোনও মওকাই তারা হাতছাড়া করতো না।

হিজরতের পর, মক্কার কোরেশরা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে হাত মিলিয়েছিল ইহুদীদের সঙ্গে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার জন্য। মুনাফেকরা তো সেখানে ছিলই, তারাও তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছিল পঞ্চম বাহিনীরূপে। ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ ছাড়াও তারা তাদের প্রচারণার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার নেটওয়ার্কও গড়ে তুলেছিল। প্রপাগাণ্ডাকারী কবিরা––যাদেরকে ম্যাক্সিম রডিনসন বলেছেন, 'সে যুগের সাংবাদিক' এবং কারমাইকেল বলেছেন, 'যুদ্ধের আগুন জ্বালানো লোক',[২] তারা––মুসলমানদেরকে এই বলে অভিযুক্ত করতো যে, তারা একজন বহিরাগত লোকের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদেরকেই অপমান করছে। কায়লার সন্তানদেরকে (আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে) আবূ আফাক বিদ্রূপ করে গাইতো ঃ

দীর্ঘকাল বেঁচেছি আমি, কিন্তু কখনো দেখিনি আমি

কোন গৃহকে অথবা কোন জনতাকে

এত অনুগত এত বিশ্বস্ত --

বন্ধুদের প্রতি যখন তারা ডাক দিয়েছে তাকে --

কায়লার সন্তানদের চাইতে

(আওস ও খাযরাজরা) সবাই মিলে,

পাহাড় ধ্বসে পড়বে তাদের বশ্যতার পূর্বে,

অথচ তাদের মধ্যে এলো এক উস্ট্রারোহী এবং

বিভক্ত করে দিল তাদেরকে

(সে বলে) 'এটা সিদ্ধ, ওটা নিষিদ্ধ'

সব কিছুতেই

কিন্তু, তোমাদের যদি বিশ্বাস থাকতো ক্ষমতায়

এবং শক্তিতে, তাহলে

কেন ধাওয়া করনি এক 'তুব্বা'কে?$_৩$

আবূ আফাকের কথার অর্থ ছিল, "তুব্বা ছিল, আর যাই হোক দক্ষিণ আরবের একজন প্রসিদ্ধ রাজা, তবু তোমরা তাকে প্রতিহত করেছিলে। কিন্তু এখন তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা মক্কার একজন 'মোহাজের'-এর সমস্ত দাবী মেনে নিচ্ছ?"

ইতোমধ্যে, ইহুদীদের নেতা নির্বাচিত হয়েছিল কাব। সে মালিক বিন আস্‌সাঈফ$_৪$-এর স্থলাভিসিক্ত হয়। বদর$_৫$ যুদ্ধে কোরশদের পরাজয়ের পর সে শোকাভিভূত হয়ে পড়ে। তার রচিত একটি শোকসঙ্গীতে সে বলেছিল ঃ

তাড়িয়ে দাও তোমাদের ঐ আহাম্মকটাকে

যাতে নিরাপদ হতে পার তোমরা

ঐ সমস্ত কথা থেকে যার কোন অর্থ নেই!

তোমরা কি উপহাস করছ আমাকে, কারণ

আমি অশ্রুপাত করছি

এমন এক জাতির জন্য যারা আমাকে

অন্তর দিয়ে ভালবাসে?

যতদিন আমি বাঁচবো, আমি কাঁদবো এবং

আমি স্মরণ করবো

সেই জাতির গুণাবলী

গৌরব যার মক্কার গৃহগুলি।[৬]

স্পষ্টতঃই, এই সমস্ত অশ্লীল ও অপমানকর প্রচারণার আসল উদ্দেশ্য ছিল, একদিকে, আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে এবং অপরদিকে আওস ও খায-রাজদের মধ্যে কলহ-বিবাদের বীজ উপ্ত করা। এই প্রচারণায় প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো যখন বনু কায়নাকা গোত্রের একজন ইহুদী, শাস বিন কায়েস, এক ইহুদী যুবককে নির্দেশ দিল বুয়াসের যুদ্ধের সময়ে রচিত কতকগুলো কবিতা আবৃত্তি করতে। এবং সে এগুলো আবৃত্তি করতে লাগলো আওস ও খাযরাজ গোত্রের কিছু সংখ্যক মুসলমানদের এক মিশ্র সমাবেশে। এর ফলে, উভয় পক্ষই উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করে বসলো এই বলে ঃ 'তোমরা যদি তা-ই চাও, তাহলে আবারও আমরা প্রস্তুত।' উভয়পক্ষই জবাব দিল ঃ আমরা তা-ই করবো। তোমাদের সাক্ষাতের স্থান বাইরে--অগ্নিগিরির ময়দান! 'অস্ত্র ধর! অস্ত্র ধর!'[৭] এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহাজেরদেরকে নিয়ে হযরত রসূলে পাক (সাঃ) দ্রুত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

> ' হে মুসলিমরা ! তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর! আল্লাহকে স্মরণ কর! আমি তোমাদের মধ্যে থাকতেই কি তোমরা মুশরেকদের মত ব্যবহার করবে? আল্লাহ্ তোমাদেরকে ইসলামে হেদায়াত দান এবং তোমাদেরকে সম্মান দান এবং তোমাদেরকে মূর্তি ও প্রকৃতির উপাসনা থেকে পরিত্রাণ দান করার পরও? তোমাদেরকে তিনি অধর্ম থেকে উদ্ধার করে তোমাদেরকে পরস্পর বন্ধু করে দেওয়ার পরও?[৮]

এই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল কোরআন করীমের এই আয়াতগুলি ঃ[৯]

> "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের মধ্য থেকে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে কোন এক দলের আনুগত্য কর

(তাহলে), তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফের করে নিবে। এবং তোমরা কীরূপে অবিশ্বাস করতে পার এমতাবস্থায় যে, তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হচ্ছে এবং তাঁর রসূল তোমাদের মধ্যে (বিদ্যমান) আছে? এবং যে কেউ আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে, বস্তুতঃ, তাকে অবশ্যই সরল–সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করা হয়েছে। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেভাবে তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। এবং তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ কোরো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও। এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হইও না; এবং স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চারিত করলেন, এবং তোমরা তাঁরই নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে, এবং তোমরা ছিলে এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায়, তিনি সেখান থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করলেন। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।"
--(আলে ইমরান–৩ঃ১০২-৮)

এটাই ছিল মদীনার পরিস্থিতি। এবং সেই অস্থির পরিস্থিতিতে রসূলে পাক (সাঃ) ঐ সব কবিদের প্রচারণার অভিযানকে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে হত্যা করার জন্য আহ্বান জানালেন স্বেচ্ছাসেবকের জন্য। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, তারা শান্তির জন্য মারাত্মক হুমকী হয়ে উঠেছিল। রসূলে পাক (সাঃ)–কে নিন্দা এবং অপমান করার জন্যই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল বলে যারা প্রচার করে, তারা ঐতিহাসিক সত্যকেই বিকৃত করে। এই সব হত্যার ঘটনাকে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর নিন্দাকারীকে হত্যা করার নযীর হিসেবে পেশ করাটা, হয় স্বেচ্ছাকৃত অসাধুতা, নয়তো স্রেফ ঐতিহাসিক অজ্ঞতা। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অবমাননা–যাকে বলা হয় 'সব্ব্'––তা কোরআনের মতে না কোন 'হদ্দ্'-এর অপরাধ, না 'সুন্নাহ্' অনুসারে কোন মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ। এটা, বস্তুতঃ, আদৌ কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়, যদি না এর সঙ্গে অন্য কিছু জড়িত থাকে। এর শাস্তি, ধর্মত্যাগের শাস্তির মতই, একমাত্র খোদাতা'লার হাতেই ন্যস্ত। পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ এবং তাঁর

রসূলের সম্মানকে সমুন্নত রাখার জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তির ব্যবহারের কথা বলেছে, তরবারি ব্যবহার করতে বলেনি। পবিত্র কোরআনের নির্দেশঃ

> "এবং তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যাদেরকে তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে (উপাস্যরূপে) ডাকে, নতুবা তারা অজ্ঞতার কারণে শত্রুতাবশতঃ আল্লাহ্কে গালি দিবে। এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের কৃতকর্ম মনোহর করে দেখিয়েছি। অতঃপর, তাদের প্রভুর পানে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে; তখন তিনি তাদেরকে তারা যে কাজকর্ম করতো সে সম্পর্কে অবহিত করবেন।" (আন্‌আম–৬ঃ১০৯)

কারো প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা ও ভক্তি আসে হৃদয় থেকে। বল প্রয়োগে মুখ বন্ধ করতে পারে, ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে, যার পরিণাম অসম্মান ও অশ্রদ্ধা। এ কারণেই হৃদয়ের ব্যাপারে কোরআনের দৃষ্টি ভঙ্গী অত্যন্ত পরিষ্কার ও ইতিবাচক। রসূলে পাক (সাঃ)-এর মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের কথা হচ্ছেঃ

> "নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করেন এবং তাঁর ফেরেশ্‌তারাও। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাৎ করেন ইহকালেও পরকালেও, এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। যারা মুমিন ও মুমিনাদেরকে কোন দোষ না করলেও কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা নিজেদের উপর চাপিয়ে নিয়েছে। (আল্ আহযাব – ৩৩ঃ৫৭–৫৯)

'সব্ব্'-এর ব্যাপারে পবিত্র কোরআন অত্যন্ত পরিষ্কার। এই গ্রন্থ অবিশ্বাসীদের মিথ্যা উপাস্যগুলোকেও গালি দিতে নিষেধ করেছে। মুসলমানদেরকে এবং রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যেও কোন শাস্তির বিধান রাখেনি; এদের জন্য খোদা 'ঘৃণিতের শাস্তি' প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এবং সেই 'সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত' যিনি তিনিই বা কীরূপ আচরণ করেছিলেন তাঁর অবমাননাকারীদের সঙ্গে? চলুন, আমরা আর একবার সেই মুনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর ঘটনাটার প্রতি দৃষ্টিপাত করি। আল্-মুস্তালিক যুদ্ধের (হিঃ৬ / খৃঃ ৭৩৭) পর, সেখানকার আল্-মুরায়সীর পানির কুয়ার স্থানে রসূলে পাক (সাঃ)-এর অবস্থানরত অবস্থাতেই, একটা অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল। উমর (রাঃ)-এর একজন বেতনভোগী চাকর জাহ্জাহ্ বিন মাসুদ এবং আনসারদের একজন মিত্র সিনাব বিন্ ওয়াবার আল্-জুহানীর মধ্যে মারামারি লেগেছিল। ঘটনাটি সম্পর্কে ইবনে ইসহাক বলেছেনঃ

> জুহানী বংশের লোকটি চীৎকার করে ডাকতে লাগালো, 'ওহে, আনসার লোকেরা!' জাহ্জাহ্ও ডাকতে লাগলো, 'ওহে মুহাজের লোকেরা!' আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল দারণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। তার সঙ্গে তার কিছু লোকজনও ছিল, এদের মধ্যে যায়েদ বিন আরকাম নামক একটি নব্যযুবকও ছিল। সে (আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই) বলতে লাগলোঃ তারাই কি এই কান্ড ঘটিয়েছে? তারা আমাদের লংঘন করেছে। সংখ্যায় তারা আমাদের দেশে আমাদেরকেই ছাড়িয়ে গেছে। এখন আমাদের জন্য এবং হতচ্ছাড়া কোরেশদের জন্য সঠিক কথা তো সেই প্রাচীন প্রবাদ বাক্যই "কুকুরকে খেতে দাও, শেষে ওটা তোমাকেই খাবে।' আল্লাহ্র কসম! যখন আমরা মদীনায় ফিরে যাব তখন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত যে সে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টকে তাড়িয়ে দিবে।" অতঃপর, সে তার লোকদের কাছে গেল এবং বললো, "এই তো অবস্থা যা তোমরা নিজেরাই সৃষ্টি করেছ নিজেদের জন্য। তোমরা তাদেরকে তোমাদের দেশ দখল করতে দিয়েছ এবং নিজেদের সহায়-সম্পত্তিও ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছ তাদের মধ্যে। তোমরা যদি শুধু তোমাদের সম্পত্তিই তাদেরকে না দিতে তাহলে অন্যত্র চলে যেতে তারা বাধ্য হতো।" জায়েদ বিন আরকাম এসব কথাই শুনেছিল। শত্রুরা চলে গেলে পর সে রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) কাছে গেল এবং সব কথা জানালো। উমর (রাঃ) ছিলেন সেখানে, তিনি বললেন, 'আব্বাস বিন বিশ্রকে বলুন, তাকে গিয়ে হত্যা করতে।' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, ' কি

বলছো'? লোকেরা তো বলবে 'মুহম্মদ নিজের সঙ্গীদেরকেই হত্যা করে'[10] না, তা হবে না, বরং ফিরতি যাত্রার হুকুম দাও'।

রসূলে পাক (সাঃ), অবশ্য, বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। আনসারদের প্রতি জুহানীর গোত্রীয় আহ্বান এবং মুহাজেরদের প্রতি জাহ্জাহ্‌র আহ্বান তাঁকে মনে করে দিয়েছিল 'বুয়াস দিবসের' কথা, 'বসূস যুদ্ধের' কথা –যে যুদ্ধ চলেছিল চল্লিশ বছর ধরে। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল যদি আনসারদেরকে দলে ভিড়াতে পারতো, তাহলে মুহাজেররাও তাদের গোত্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহে ফিরে যেত। ইসলামী ঐক্যের বাণী –যা এই বহুধা বিভক্ত গোত্রগুলোকে একটি শক্তিশালী আরব জাতিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল–তা চিরদিনের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেত। রসূলে পাক (সাঃ) এতটা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি সেখান থেকে রওয়ানা দেওয়ার হুকুম দিলেন, যদিও ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন 'এটা ছিল এমন একটা সময়, যে সময়টাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন সফরে যেতেন না।'[11]এই ঘটনার সূত্রে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

> তারা বলে, 'যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিবে।' অথচ, (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর রসূল ও মুমিনদের জন্য; কিন্তু মুনাফেকরা তা জানে না।" (আল্ মুনাফেকূন- ৬৩ঃ৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের পুত্র আব্দুল্লাহ্ যখন এই ঘটনার কথা শুনতে পেলো, তখন সে রসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে গেল এবং বললোঃ

আমি শুনতে পেলাম যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাই সম্পর্কে আপনি যা শুনেছেন, তজ্জন্য তাকে আপনি হত্যা করতে চান। আপনি যদি তা করতে চান, তাহলে আমাকেই হুকুম করুন তা করতে; আমি তার গর্দান থেকে কল্লা জুদা করে ফেলবো। কেননা, আল্–খাযরাজ গোত্র জানে যে, তাদের মধ্যে আমার চাইতে পিতৃভক্ত আর কেউ নেই। আমার ভয় এটাই যে, আপনি যদি তাকে হত্যা করার জন্য অপর কাউকে আদেশ দেন, তাহলে সেই হত্যাকারীকে চলাফেরা করতে দেখাটা আমি বরদাস্ত করতে পারবো না এবং তাকে হত্যাই করে

ফেলবো। এর অর্থ হবে, একজন কাফেরের জন্য আমি একজন মুমিনকে হত্যা করেছি, এবং এর্জন্য নিশ্চয় আমি দোষী সাব্যস্ত হবো।' রসূলে পাক (সাঃ) বললেন, 'না, বরং আমাদের উচিত তার প্রতি দয়ার সহিত ব্যবহার করা এবং সে যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছে ততক্ষণ তার সঙ্গীত্বকে সম্পূর্ণরূপে খাতির করে চলা।[১২]

মুসলিম রাজা–বাদশাহ্দের মধ্যে যাঁরা এটা বুঝতেন যে, কেন রসূলে পাক (সাঃ) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এবং অন্যান্য মুনাফেকদের সঙ্গে এবং ইহুদীদের সঙ্গেও ঐরূপ ব্যবহার করেছিলেন, তাঁরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মান (নামুস–ই–রসূল) রক্ষার নাম করে মিথ্যা শহীদ বানাবার ব্যাপারে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কর্দোভায়, ৮৫০ থেকে ৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে, ইউলোজি উসের (Eulogius) নেতৃত্বে খৃষ্টান জিলেটদের(উগ্রবাদীদের) একটা দল গঠিত হয়েছিল। এই দলটির সদস্যরা এ ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিল যে, তারা রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রকাশ্যে নিন্দা ও অসম্মান করবে, এবং এজন্যে শাহাদৎ বরণ করবে। কিন্তু, কর্দোভার কাজীরা তাদের এইরূপ শাহাদৎ বরণের দাবীকে অগ্রাহ্য করে এবং তাদেরকে কারাদন্ড দান করেন। এই ধরনের এক ঘটনার বর্ণনায় উইল ডুরান্ট (Will Durant) বলেছেন ঃ

আইজ্যাক (Issac) , একজন কর্দোভান পুরোহিত, একবার কাজীর দরবারে গেল এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার ইচ্ছার ঘোষণা দিল। কিন্তু, কাজী যখন, খুব সন্তুষ্টচিত্তে, তার কাছে মুহাম্মেডানিজমের (ইসলামের) ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন, তখন সেই পুরোহিত মাঝখানে বাধা দিয়ে বলতে লাগলো, 'তোমাদের নবী মিথ্যা বলেছে এবং তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে। অভিসম্পাৎ তার উপরে, সে তার সঙ্গে বহু হতভাগ্যকে দোযখে টেনে নিয়ে গেছে।' কাজী তাকে তিরস্কার করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে নাকি? জবাবে পুরোহিতটি বললো 'আমার মন-মেজাজ সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। আপনি আমাকে মৃত্যুদন্ড দিন।' কাজী তাকে কারাদন্ড দিলেন, কিন্তু তিনি আব্দুর রহমান, দ্বিতীয়,-এর কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠালেন তাকে উন্মাদ বলে খালাস দিতে।[১৩]

মহানুভব সুলাইমান (Sulaiman the Magnificient) -এর সালতানাতের আমলে ওসমানীয় (Ottoman) সাম্রাজ্যের প্রধান মুফতী ছিলেন শাইখুল ইসলাম আবূসওউদ আফেন্দী (Ebus'u'ud Effendi)। তিনি মৃত্যুদন্ডও প্রদান করতেন বটে, কিন্তু তা শুধু সেই সকল অপরাধীর ক্ষেত্রে যারা প্রকাশ্যে জনগণের কাছে রসূলে করীম (সাঃ)-এর বদনাম ও নিন্দা প্রচার করতো এবং এ ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবেই জোর দিতেন যে, মৃত্যুদন্ডের আদেশ যেন হাল্কাভাবে দেওয়া না হয়। স্পষ্টতঃই তিনি তুচ্ছ এবং বিদ্বেষমূলক নালিশ এড়িয়ে চলতেন, এবং এই নীতি নিয়মেরও প্রবর্তন করেছিলেন যে, কোন অভিযুক্তকে মাত্র দু'একজনের কথার ভিত্তিতেই 'অভ্যস্ত' বলে সাব্যস্ত করা যাবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তির অভ্যস্ত হওয়ার চরিত্র কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশিত হতে হবে এমনসব নিরপেক্ষ ঐ বেগরজ মুসলিম সাক্ষী–সাবুদের দ্বারা, যাদের মনে কুমতলব নেই। কিন্তু, এক্ষেত্রে একটি সংশোধনী ধারাও যোগ করা ছিল, এবং তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদিও শাইখুল ইসলাম আবূ সওউদ 'ফতওয়া' দিয়েছিলেন, তবু তার সমর্থনে কোরআন ও হাদীসের কোন কথার কোন উল্লেখ করেন নি। কেননা, তিনি জানতেন যে, 'সব্ব'––এর শাস্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতেই ন্যস্ত। সেই 'ফতওয়াটি' সম্ভবতঃ ইস্যু করতে হয়েছিল রাজনৈতিক চাপেই। কারণ, সেই 'ফতওয়ার' সমস্ত কার্যকারিতা তিনি নাকচ করে দিয়েছেন এই কথার দ্বারা যে, কাফেরদেরকে (অবিশ্বাসীদেরকে) এমন কোন ঘোষণা দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না যা তাদের কুফরী বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত'ঃ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নুবওয়কে প্রত্যাখ্যান করার জন্য (তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না)।

কোন মুসলমানের ঈমানের গভীরতা এবং সে রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি যে শ্রদ্ধা পোষণ করে তার পরিমাণ আইনগত নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। অপরদিকে, কোন অবিশ্বাসীকে না জোর করে ইসলাম কবুল করানো যাবে, না তাকে বন্দুকের মুখে রসূলে পাক (সাঃ)–কে সম্মান করতে বাধ্য করা যাবে। এবং এজন্যই, আল্লাহ্ 'ইরতেদাদ' অথবা 'সব্ব্'–এর জন্য এই দুনিয়াতে শাস্তি দানের কোন বিধান দেননি। আর তাই, আল্-মুরায়সীর পানির কূপের কাছে (যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও) অপমানকর উক্তি করা সত্ত্বেও রসূলে পাক (সাঃ) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে কোন প্রকার শাস্তি দান করেন নি।

এই দুই অপরাধের শাস্তিকে রাজনৈতিক–উদ্দেশ্য প্রণোদিত আলেমরা অনায়াসেই কাজে লাগিয়েছে। এরা ধর্মীয় বিষয়াদিকে পার্থিব স্বার্থে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে ধর্মীয় বিশ্বাসকে ব্যবহার করতে পারে।[১৪] (দ্রঃ মুনীর কমিশন রিপোর্ট)

এখন তো, দেওবন্দী / আহলে হাদীস আলেমরা রসূলে পাক (সাঃ)–কে অবমাননা করার জন্য দোষ দিচ্ছে আহমদীদেরকে। কিন্তু, তারা এটা বুঝতে পারছে না যে, এতে করে তারা তাদের নিজেদেরই ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি করছে। তারা তো সুন্নীদের মূলধারার তুলনায় একেবারেই সংখ্যালঘু। নজদী সংস্কারক আব্দুল ওহাবের অনুসারীদের অবস্থাও তদ্রূপ, একমাত্র নজদ্ ছাড়া। সুন্নীরাইতো এই উপমহাদেশে[১৫], তুরস্কে এবং আরো মুসলিম দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদেরকেও দোষ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা রসূলে করীম (সাঃ)-কে হেয় করছে। দেওবন্দী / ও'হাবী আলেমরা মনে করে যে, মূলধারার সুন্নীরা সবাই 'কাফের'। কেননা, তারা রসূলে পাক (সাঃ)-এর গুণাবলীতে বলতে কি, অংশীবাদিতা এবং খোদায়ী আরোপ করে। যেমন, তারা বলে যে, রসূলে পাক (সাঃ) যেহেতু আলো দিয়ে পরিপূর্ণ বা তৈরী সেহেতু তাঁর দেহের কোনও ছায়া ছিল না। তুর্কী কবি সুলায়মান সেলেবী (বসরা–১৪১০) 'মওলুদ–ই–শরীফ'–কে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং তিনি এর শেষে যোগ করেন 'ইয়া নবী সালাম আলায়কা' (হে নবী তোমার উপর সালাম); তিনি এটা করেন, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, এখন নবী করীমের (সাঃ) আত্মা এখানেই, এই অনুষ্ঠানে, অবতীর্ণ হয়েছেন, অতএব, উপস্থিত সবাইকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়াতে হবে। একইভাবে তাঁর (সাঃ) মাজারে প্রার্থনা করা মাজার শরীফের চারপাশের গ্রীলের বেষ্টনীতে চুমু দেওয়া ইত্যাদি, সুন্নী / বের্‌লভীদের অনেক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানকে 'শির্‌ক' বলে অভিহিত করে দেওবন্দীরা। ও'হাবীরা ঐতিহাসিক 'জান্নাতুল বাকী' গোরস্থানকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর, রসূলে পাক (সাঃ)-এর মসজিদের গম্বুজকে পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু, এর বিরুদ্ধে সারা মুসলিম জাহানে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়াতে তা করতে পারেনি। কবরস্থান, মাজার, গম্বুজ ইত্যাদি ধ্বংস করার কার্যকলাপের জন্য ও'হাবীদেরকে সারা দুনিয়ার সুন্নীরা অভিযুক্ত করে থাকে এই বলে যে, তারা রসূলে পাক (সাঃ)-কে হেয় প্রতিপন্নকারী এবং তাঁর (সাঃ) প্রতি কলঙ্ক আরোপকারী।

বের্‌লভীরা মনে করে যে, দেওবন্দী বিশেষজ্ঞ মওলানা মুহাম্মদ কাশেম নানুতবী এবং মওলানা আশরাফ আলী থানবী ছিলেন 'খতমে নবুওয়তে'

অবিশ্বাসী। 'দেওবন্দী মৌলবীউঁ কা ঈমান' নামক একটি পুস্তিকায় মওলানা আব্দুল মোস্তফা আবূ ইয়াহ্ইয়া মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন শাফী-ই কাদ্‌রী রিজভী থানবী লিখেছেনঃ

> 'হে মুসলমানরা! দেখ, কীভাবে এই অভিশপ্ত, অপবিত্র, শয়তানী দাবী খতমে নবুওয়তকে ধ্বংস করে দিয়েছে...............দেখ ঐ মৌলবী কাসেম নানুতবী খতমে নবুওয়তকে বিশ্বাস করে না; যদিও মৌলবী রশীদ আহ্‌মদ, মৌলবী খলীল আহ্‌মদ এবং অন্যান্য ও'হাবী উলেমা ঘোষণা দিয়েছেন যে, খতমে নবুওয়ত প্রত্যাখ্যানকারীরা হচ্ছে কাফের।[১৬]

হযরত রসূলে পাক (সাঃ) ছিলেন বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা ও শালীনতার অবতার অথচ তাঁকেই রক্ষা করার নামে বেরলভী দেওবন্দী তর্কবাগীশরা অশ্লীলতার এত নীচু স্তরে নেমে গেছে যে, তাদের সব চাইতে নরম কথাগুলোও অপমানজনক, আক্রমণাত্মক। শোরেশ কাশ্মিরী নামক, দেওবন্দী গোষ্ঠীর একজন সমর্থক, তাঁর রচিত 'কাফির সাজ মোল্লা' শীর্ষক একটি প্যামফ্লেটে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি দেওবন্দের মহান নেতাকে 'কাফের' বলে ঘোষণা করে সে মিথ্যাবাদী। একই প্যামফ্লেটে তিনি বলেছেন যে, বেরলভী আলেমরা ধর্মকে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর শরীয়া'কে বিক্রী করে করে তাদের জীবিকা উপার্জন করে। এবং তারা লর্ড ক্লাইভের পরিবারের জন্মের গোলাম এবং মুসলিম লীগ ও কায়েদে আজম জিন্নাহ্‌র দুষমন। আরেকটি প্যামফ্লেটে তিনি বলেছেন যে, এই লোকগুলো তো মওলানা হোসেইন আহমদ এবং সৈয়্যদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বোখারীর পায়খানার একটা ইটের চাইতেও অধম।[১৭]

এই সমস্ত গালিগালাজ ভরা চার্জের যে জবাব বেরে্লভীরা দিয়েছে তা-ও সমভাবেই ইতর ও অমার্জিত। এরা বলে, যে লোকটা তাদের এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে গীবত করে বেড়াচ্ছে সে তো তার জীবন কাটিয়েছে পতিতা-পল্লীতে। "যে লোকটা নেহরুকে বলেছিল রসূল, সে-ই কিনা এখন আমাদেরকে এই দোষ দিচ্ছে যে, আমরা রসূলের শরীয়ত বিক্রী করে খাই।" এরাই জোর গলায় আওয়াজ তুলেছে, 'কেন মোহাম্মদ কাসেম নানুতবীকে কাফের বলা হবে না? কি করে আমরা স্বীকার করতে পারি যে, আশরাফ আলী থানবী একজন মুসলমান ? এরাই কি নয় সেই সব লোক, যারা বলে যে নবুওয়তের দরজা খোলা আছে ? এরাই কি কাদিয়ানীদের পথপ্রদর্শক নয় ? কে তোমাদেরকে শিখিয়েছে কী করে মোস্তফাকে অবমাননা করতে হয় ? কে তোমাদেরকে কুফরী

শিখিয়েছে? তোমরা তো উলঙ্গ হয়ে পড়েছে, তোমাদের কি সম্ভ্রম-শালীনতা বোধও নেই ? তোমরাই তো খতমে নবুওয়তের নামে ফেৎনা ছড়িয়েছ, বিশৃংখলা ছড়িয়েছ। তোমরাই তো শান্তির নামে কলহ-ফাসাদ ছড়িয়েছ। তোমরাই তো নবুওয়তের নামে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছ, নবীর নাম ভাঙ্গিয়ে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছ। আর এক কবি, সাইয়েদ মোহাম্মদ তান্‌হা, লিখেছেন ঃ

তুমি কি করে বুঝবে আহমদ রাজার উঁচু মাকাম ?

তুমি যাও এবং হিন্দুদের পূতিগন্ধময় লেংটির গন্ধ নাও।

সোনা হচ্ছে তোমা নবী, সোনাই তোমা খোদা

তুমি তো সেই দলেরই লোক যারা তোমা সোনা দেখায়

তুমি সারা জীবন কাটিয়েছ কুফরীর সঙ্গে

তুমি একজন ক্ষত্রিয় হিন্দু, তুমি কী করে ইসলামে আসবে ?

হে নমরূদ! তুমি কী করে আল্লাহ্‌র মহিমা গাইবে ?

তোমার জায়গা তো হিন্দুদের সঙ্গে, সেখানেই যাও এবং

নামকীর্তন কর 'হরি' 'হরি' বলে।[১৮]

তুলনা করুন ঃ দেওবন্দী আলেমদের এই সব আক্রমণের ভাষা, বাক্‌ভঙ্গী ও বিষয়-বস্তুর সঙ্গে আহমদীদের বিরুদ্ধে ঐ দেওবন্দী আলেমদের দীর্ঘদিনের উৎকট কুৎসা ও নিন্দার, যখন তারা বলেঃ

১. আহ্‌মদীরা 'খতমে নবুওয়ত' মানে না ;

২. আহ্‌মদীরা রসূলে পাকের (সাঃ) অবমাননা করে ;

৩. আহ্‌মদীরা হিন্দুস্থানে ব্রিটিশ রাজত্বে কায়েম করেছে ;

৪. আহ্‌মদীরা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছে ;

৫. আহ্‌মদীরা 'জিহাদ'—এর বিরোধী ;

৬. আহ্‌মদীরা অমুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করে ;

৭. আহ্‌মদীয়্যত হচ্ছে ধর্মের নামে প্রতারণা।

তাহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত (বেরে্লভী) এবং দেওবন্দী আলেমরা একে অপরের প্রতি এই দোষারোপ করে যে, তারা রসূলে পাক (সাঃ)-এর অবমাননাকারী। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, জামা'তে ইসলামীর মতানুসারে

'আহ্‌লে কোরআন' ফের্কা আহ্‌মদীদের চাইতেও খারাপ। শিয়াদেরকেও, কিন্তু, ছেড়ে কথা বলা হয়নি–তাদের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ আছে যে, তাদের যে দাবী–হযরত আলী (রাঃ) হচ্ছেন হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়তের অংশীদার –এর দ্বারা তারা তাঁর (সাঃ)–মাকাম ও মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে।

> ক্যানাডিয়াম বিশেষজ্ঞ, উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, এই উপমহাদেশ সফরের সময় ভারত ও পাকিস্তানের মুসলিম সমাজকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই এলাকার মুসলমানদের প্রতি এই বলে দোষারূপ করেছেন যে, তাদের মধ্যে 'আগুন-ছড়ানো প্রচণ্ড ধর্মীয় গোঁড়ামি' বিরাজমান। তিনি তাঁর 'ইসলাম ইন্ মর্ডান ইন্ডিয়া' (Islam in Modern India) নামক পুস্তকে লিখেছেন ঃ মুসলমানরা আল্লাহ্‌র উপরে আক্রমণ সহ্য করবেঃ সেখানে নাস্তিক আছে, নাস্তিকতার উপরে প্রকাশনা (বই-পত্র) আছে, এবং অশেষ যুক্তিবাদী সমাজও আছে; কিন্তু মুহাম্মদকে অবমাননা করা হলে, তা সেখানকার সম্প্রদায়ের, এমনকি, সর্বাপেক্ষা উদার শ্রেণীর মধ্যেও আগুন-ছড়ানো প্রচন্ড ধর্মীয় গোঁড়ামিকে উত্তেজিত করে তুলবে।[১৯]

মুসলিম মেযাজ সম্পর্কে এই আন্দাজটা ঠিক নয়। প্রফেসর স্মিথ ব্যাপারটাকে সার্বজনীন করে ফেলেছেন। আসলে, মোল্লারা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নেতৃত্বই শুধু এটার স্বীকৃতি দেয় যে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি কোন প্রকৃত অথবা কোন কাল্পনিক অপমান একজন মুসলমানের অনুভূতিকে যত সহজে উত্তেজিত করে এবং তার ঘৃণা ও ক্রোধকে জাগিয়ে তোলে তত আর অন্য কিছুতে কখনই হয় না।[২০]

সন্দেহ নেই যে, ধনী ও গরীব, বুদ্ধিজীবী ও অশিক্ষিত, সৎ ও অসৎ সবাই হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর ভালবাসায় ঐক্যবদ্ধ, এবং সবাই বিশ্বাস করে যে, 'ফানা-ফির-রসূল' (রসূলের নামে বিলীন) হচ্ছে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ স্তর। তবে, কোন মুসলমানই এ ব্যাপারে গাফেল নয় যে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর 'মেরাজ'। 'মেরাজে' তিনি মেঘপুঞ্জের ন্যায় ফেরেশ্‌তামন্ডলীর ভীড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় উন্নীত হতে হতে শেষে একান্ত ঐশী সন্নিধানে উপনীত হয়েছিলেন, যেখানে স্বয়ং জিব্রাঈল ফেরেশ্‌তারও প্রবেশাধিকার নেই। ক্ষমতা-লোভী মুসলিম নেতৃত্ব একথা ভুলে যায় যে,

'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' ধর্ম-কথাটি হচ্ছে মুসলিম-ঈমানের স্বীকৃতির দ্বিতীয় অংশ। প্রথম হচ্ছে ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' –– 'নাই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ছাড়া'।

ভালবাসা ও ভক্তি পরিমাপের কোন পন্থা নেই। প্রেমিকরা ও সুফী-সাধকরা 'দীওয়ান' এর পর 'দীওয়ান' রচনা করে গেছেন, এবং অবশেষে, ভাষা যা প্রকাশ করতে পারে না, সেই অনুভূতি প্রদানের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাই, এটা কোন আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয় যে, ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠার নাম দেওয়া হয়েছে ' গোলাম আহ্মদ। –(আহ্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলাম)।

কত দুর্লভ এই সম্মান! কত সুউচ্চ এই মাকাম ! কত মহান এই গৌরব ! তাঁর (আঃ) প্রতি যারা দোষারোপ করে যে, তিনি রসূলে পাক (সাঃ)-এর অবমাননা করেছেন তাদের, এবং উব্লিউ. সি. স্মিথের যে অভিযোগ ঃ মুসলমানরা আল্লাহ্‌র সম্মানের ব্যাপারে গাফেল, –তারও জবাব মিলবে তাঁর (আঃ) মাত্র তিনটি শ্লোকের মধ্যেইঃ

"আল্লাহ্‌র প্রেমের পর মুহাম্মদের প্রেম

আমার হৃদয় মোহিত করেছে,

এ যদি কুফরী হয়, তাহলে

খোদার কসম ! আমি শক্ত কাফের।"২১

"আমার প্রেম ! আমার দয়াময় ! তোমার পথে আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক ! কারণ এই দাসের প্রতি তুমি কি কখনও দেখিয়েছ তোমার দয়ার উদাসীনতা?"২২

" যদি এটাই রীতি হয় যে, তোমার প্রেমের দাবীদারদের শিরচ্ছেদ করা হয় তোমার দরজার চৌকাঠের গোড়ায় তাহলে জানানো হোক যে, সেই পুরস্কারের প্রথম যে দাবীদার, সে আমিই।"২৩

'খাতামুন্নাবীঈন' হিসেবে রসূলে পাক (সাঃ)-এর সর্ব্বোচ্চ কর্তৃত্বের প্রতি আপন ঈমানকে পরিষ্কারভাবে এবং সাধুতার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন ইসলামের আহ্মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা (আঃ)। তিনি বলেছেন ঃ

> 'আমাদের ধর্মের ভিত্তি এবং আমাদের ঈমানের মর্ম হচ্ছে–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ –আল্লাহ ছাড়া মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত পুরুষ। যে ধর্ম আমরা পালন করে চলি,

–এই দুনিয়ায়, এবং যে ধর্মে আমরা, আল্লাহ্‌র কৃপায়, এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিদায় নিব, তা হচ্ছে আমাদের প্রভু ও নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ধর্ম।২৪

তিনি আরো বলেছেন ঃ

'এক অতি উচ্চ মাকাম – যার মধ্যে সকল মঙ্গল নিহিত তার অধিকারী হচ্ছেন আমাদের প্রভু ও নেতা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এই মাকাম অনন্য, অপরের নাগালের উর্ধ্বে।২৫

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের রচয়িতা মির্যা গোলাম আহমদকে (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা করেছে ঐসব মুসলমানেরা যাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্যার মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৫–১৯৩৮) তাঁর এক উর্দূ কবিতায় লিখেছেনঃ

শক্তিশূন্য হস্ত তোমার ; নাইক হৃদে সে ঈমান জোর,
'উম্মত' হয়ে 'পয়গম্বরের' নিন্দাকারী, ধিক্ প্রাণে তোর।

বিদায় সব বুত্ ভঙ্গকারী, বুতপূজারী আজ করে শোর ;
ইব্রাহীমের বংশে আখের পুত্র হলে কিনা আযর !২৬

পানকারী সব নূতন নূতন, পাত্র নূতন মদ্য নূতন,

কাবা নূতন, বুতও নূতন, তোমরা বেবাক অদ্য নূতন।

তোমার তরে সকাল জাগার এমন লেঠা কবু ঘটে ?
আমি তোমার প্রিয় পাত্র ? না, ঘুম তোমার প্রিয় বটে ?

স্বাধীন তুমি, রমযানে তাই প্রাণটা আইটাই করে ওঠে,
বল দিকিক্ এমন করে বন্ধুজনে কিংবা শঠে ?

ধর্মেতে হয় জাতির গঠন, ধর্ম নাই তো তুমি নাই,
নাইকো যদি মাধ্যাকর্ষণ, গ্রহ সূর্য তুমি নাই ।

সংসার মাঝে অকর্মণ্য যার কুখ্যাতি সে যে তুমি ;
উদাসীন তার বাস্ত হতে হায় ! যে জাতি, সে যে তুমি।

বজ্র ঘন পোড়ায় যাহার ফসল ক্ষেতি, সে যে তুমি,
বাপ–দাদাদের গোরগুলি যার হয় বেসাতি, সে যে তুমি।

পায় কি সুনাম ভবে কবর নিয়ে যার ব্যাপার ?

পাও যদি হায় ! মাটির পুতুল বেচতে রাজি সব তোমার ।

করছে সবে হট্টগোল মুসলিম আমি নাস্তা নাবুদ,
বলব আমি সত্যি নাকি মুসলিম কোথা ছিল মৌজুদ !

খৃষ্টান তুমি বেশ ভুষাতে, সভ্যতাতে তুমি হনুদ,
মুসলমান এই ! যারে দেখে লজ্জায় মরে আজি ইহুদ ।

সৈয়্যদ কিংবা মির্যা কিংবা হতে পার আফগানও ;
সব তুমি হতে পার ? ঠিক তুমি মুসলমানও ?[২৭]

এই যামানার মুসলমানদেরকে দেখে, এমনকি, ইহুদীরাও লজ্জা পায়, তারা তাদের পিতৃপুরুষদের কবরের পাথরও বিক্রী করে খায়, ইত্যাকার সব দাবী করবার পর, 'বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ইসলামের কবি, দার্শনিক, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং সবমিলে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, এই মুসলমানদের থেকে আহ্‌মদীদেরকে আলাদা করাই উচিত। তাই, তিনি, ১৯৩৬ সালে, পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুকে (হিন্দুপ্রধান ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা, এবং পরবর্তীতে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী) লিখিত তাঁর এক খোলা চিঠিতে এই দাবী জানান যে, আহমদীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করা উচিত। অবশ্য, ধর্মনিরপেক্ষ (সেক্যুলার) ভারতের শাসনতন্ত্রে এই দাবী উপেক্ষিত হয়। কিন্তু, দেওবন্দী আলেমেদের জন্য এটা ছিল জীবন-মরণ প্রশ্ন। হিন্দুরা অযোধ্যার বাবরী মসজিদ দখল করে নিয়েছে এবং তা রাম জন্মভুমি মন্দিরে রূপান্তরিত করেছে পুলিশের হেফাযতেই। আর এক শ্রেণীর হিন্দুরা দাবী তুলেছে যে, বেনারাস ও কাশ্মীর মসজিদগুলিকে মন্দিরে রূপান্তরিত করা হোক। অধিকাংশ হিন্দুই আন্দোলন করছে যে, মুসলিম স্বতন্ত্র আইন (Muslim personal Law) বাতিল করা হোক।

এ সমস্ত কাজই করে থাকে ঐ সমস্ত লোকের যারা খোদার নবীদেরকে এবং শান্তির মানুষদেরকে অস্বীকার করে। এরা বিভেদ সৃষ্টি করে এবং এরা শান্তির আশিস ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এরাই শান্তি বিঘ্নিত করে। এবং এরাই জন্মে দেয় উগ্রবাদিতার এবং সন্ত্রাসবাদিতার।

টীকাসমূহ

১. মুনীর কমিশন রিপোর্ট, ২৫৮।

২. ম্যাক্সিম রডিনসন, 'মোহাম্মদ', অনুঃ এ্যানি কার্টার – নিউইয়র্ক, ১৯৭১), ১৯৪। 'বেদুঈনদের মধ্যেকার একজন গোত্রীয় কবি, – জোয়েল কারমাইকেলের বর্ণনা মতে, – 'কেবল একজন পদ্য লেখকই ছিলেন না, ছিলেন বরং, একজন যুদ্ধের (আগুন) প্রজ্জ্বলনকারী–তার কবিতাগুলো ছিল প্রকৃত যুদ্ধ–বিগ্রহের মারাত্মক সূচনা'। (দি শেপিং অব দি অ্যারাব্‌স, এ স্টাডি ইন এথনিক আইডেন্টিটি, নিউইয়র্ক, ১৯৬৭, ৩৮)।

৩. ইবনে হিশাম, 'কিতাব সিরাত রসূল আল্লাহ' ৯৯৫, ইংরেজি অনুবাদ ঃ অ্যানী কার্টার, রডিনসনের 'মোহাম্মদ'–এ উদ্ধৃত, ১৫৭।

৪. আলী বিন বুরহান উদ্‌দীন উল–হালাবী ' ইনসান আল্‌ উয়ূন' খ. ২, ১১৬; কিস্তার কর্তৃক উদ্ধৃত, 'দি জার্নাল অব দি ইকনমিক এণ্ড সোশ্যাল হিস্টরী অব দি ওরিয়েন্ট' খ. ৮ম, ২৬৭।

৫. ইবনে হিশাম, উদ্ধৃত, ৪৫৯।

৬. ইবনে হিশাম, উদ্ধৃত, ৫৫০, অনুঃ এ. গুইলাউম (এ. Guillaume)।

৭. প্রাগুক্ত, ৩৮৬।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত, ৩৮৭।

১০. প্রাগুক্ত, ৭২৬।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. প্রাগুক্ত

১৩. উইল ডুরান্ট, 'দি স্টোরি অব সিভিলাইজেশান' ১১ খন্ড, (নিউইয়র্ক, সাইমন এন্ড শাস্টার, ১৯৫০) খ. ৪র্থ, 'দি এজ অব ফেইথ,' ৩০১।

১৪. মুনীর কমিশন রিপোর্ট, ২৫৯।

১৫. এই উপমহাদেশে এরা সাধারণতঃ 'বেরে্‌লভী' নামে পরিচিত।

১৬. দেওবন্দী মৌলবীউঁ কা ঈমান (লায়লপুর, শাহী মসজিদ, তা. বি.)

১৭. 'রাজাখানী ফিত্‌না পরদাজুঁ কা সিয়া ঝুট'।

১৮. শাহ্‌ মুহাম্মদ আছি এবং সৈয়্যদ মুহাম্মদ তান্‌হা, 'শোরেশ' উরফ ভারে কা টাট্টু', ৭, ৮।

১৯. উইল ফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, 'মডার্ন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া,' (লাহোর দ্বি. সং. ১৯৯৪৭)

২০. মুনীর কমিশন রিপোর্ট, ২৫৭।

২১. মির্যা গোলাম আহ্‌মদ, 'ইজালা-ই-আওহাম' (অমৃতসর, ১৮৯১, ১ম খণ্ড, ১৭৬)।

২২. মির্যা গোলাম আহমদ, 'আয়না-ই-কামালাতে ইসলাম', (কাদিয়ান, ১৮৯৩, শেষ খণ্ড)।

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. মির্যা গোলাম আহমদ, উদ্ধৃত, 'ইজালা-ই-আওহাম,' ১৩৮।

২৫. মির্যা গোলাম আহ্‌মদ, তওজিহ্‌-ই-মারাম' (অমৃতসর, হিঃ ১৩০৮, ২৩)।

২৬. পবিত্র কোর আনের মতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল আযর, (আদর) নামটি দিয়েছেন চার্চ ঐতিহাসিক, ইউসেবিয়াস, তেরাহ নয় জেনেসিস ১১ঃ২৬ অনুসারে; (আল্‌ কোরআন ৬ঃ৭৫)।

২৭. স্যার মুহাম্মদ ইকবাল, 'বাঙ্গ্‌-ই-দারা' ও 'জওয়াব-ই-শিকওয়াহ্‌' স্তবক ৭, ১০ এবং ১৭. ইং, অনুঃ এ. জে. আরবেরী; (বঙ্গানুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌)।

২৮. আজিজ আহমদ এবং জি. ই. গ্রুনেবাউম (সম্পাঃ) 'মুসলিম সেল্‌ফ্‌-ষ্টেটমেন্ট ইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান' ১৮৫৭-১৯৬৮ (উইস্‌ব্যাদেন-১৯৭০), ১৩।

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ ?

আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ আবার কি ? ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক তো ঠিক তেমনি ঘনিষ্ঠ, যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আলোর সঙ্গে অন্ধকারের অথবা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর অথবা শান্তির সঙ্গে যুদ্ধের। তারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয় বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে। তাদেরকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তারা তো কখনই খুশী মনে হাত ধরাধরি করে একত্রে চলে না।

তবু, এটাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, অনেক ঘটনায় কিছু কিছু মুসলমানকে দেখা যায় যে, তারা সন্ত্রাসী ক্রিয়াকান্ডে জড়িত হয়ে পড়েছে ; এবং তারা এটা করে থাকে হয় কোন গোষ্ঠীর পক্ষে, নয়তো মুসলিম-প্রধান কোন দেশের পক্ষে।

সারা দুনিয়াতে কি অন্যান্য আরও অনেক দল অনুরূপ সন্ত্রাসী ও অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকান্ডে জড়িত নেই ? 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ' কথাটার জন্ম দেওয়া হয়েছে যে নীতি অনুসারে, সেই একই নীতির অনুসরণে কি অন্যান্য সব ব্রান্ডের সন্ত্রাসীদলকেও একই ধরনের নাম দেওয়া ঠিক হবে ? এবং এই করে শিখ সন্ত্রাসবাদ, হিন্দু সন্ত্রাসবাদ, খৃষ্টান সন্ত্রাসবাদ, ইহুদী সন্ত্রাসবাদ, নাস্তিক সন্ত্রাসবাদ, বৌদ্ধ সন্ত্রাসবাদ, সর্বপ্রাণবাদী সন্ত্রাসবাদ, প্রকৃতি পূজক সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতির একটা তালিকা প্রস্তুত করা কি ঠিক হবে ?

দুর্ভাগ্যক্রমে, আজ সারাটা পৃথিবী জুড়েই বিভিন্ন ব্রান্ডের যে সমস্ত সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রতি চোখ বন্ধ করে বসে থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বস্তুতঃপক্ষে, কোন বিশেষ আর্দশ বা কোন মহৎ উদ্দেশ্যের নামে যে সব নির্যাতন, রক্তপাত ও খুন-খারাপী চালানো হচ্ছে তার প্রতি সতর্ক হয়ে না ওঠা যে কোন দর্শকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সন্ত্রাসবাদ একটা বিশ্বজোড়া সমস্যা। সুতরাং, এ সম্পর্কে আলোচনাও হওয়া উচিত ব্যাপকতর পরিসরে। হিংস্রতার পশ্চাতে যে শক্তি নিহিত, তা না বুঝা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবো না যে, কেন কিছু কিছু মুসলিম গ্রুপ এবং রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেছে।

আমি এ ব্যাপারে সন্দেহাতীতরূপে নিশ্চিত যে, প্রায় প্রত্যেক ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যা আজকের পৃথিবীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা যে আকারেই হোক আর যে লেবাসেই হোক, তার প্রকৃতি মূলতঃ রাজনৈতিক। ধর্ম এখানে ব্যবহারকারী নয়, স্বয়ং ধর্মকেই ব্যবহার করা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা দেখি যে, সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি হচ্ছে গোত্রীয় কারণে; কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রকৃতিগতভাবে এর মূল কারণ রাজনৈতিক। অন্যান্য অনেক ছোট ছোট কারণেও সন্ত্রাসবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এবং তা ঘটে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দ্রোহজনিত কারণে। এগুলোকে মনে করা হয়, সাধারণতঃ, খেপাদের এবং নৈরাজ্যবাদীদের কাণ্ড। এক প্রকার বিশেষ ধরনেরও সন্ত্রাসবাদ আছে যা 'মফিয়া'দের (Mofia) প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সন্ত্রাসবাদ সংঘটিত হয় মফিয়ার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দল উপদলের মধ্যে। এবং, স্পষ্টতঃই, এই সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে আসলে ক্ষমতার লড়াই; অতএব, রাজনৈতিক।

আমরা যখন তথাকথিত 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের' প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে রাজনৈতিক শক্তিই সক্রিয় রয়েছে কোন ইসলামিক বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর পিছনে। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পিছন থেকে কল-কাঠি নাড়ছে যারা, যারা এদেরকে ব্যবহার করছে, তারা আসলে কেউ মুসলমানই নয়।

চলুন, আমরা এবারে, সন্ত্রাসবাদের বিশেষ কোন ঘটনা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, যাতে আমরা এর ভেতরে উপসর্গগুলো দেখে এর প্রকৃত রোগ নির্ণয় করতে পারি। আমরা ইরানকে দিয়েই শুরু করবো, এবং আমরা দেখবো, কী করে খোমেনিজমের (Khomeinism) জন্ম হলো।

একথা সবাই জানে যে, শাহ্-এর আমলে প্রাচুর্য যথেষ্টই ছিল। অতি উচ্চাভিলাষী শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানা পরিকল্পনা দেশটির ভবিষ্যৎ সম্ভবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। কিন্তু, মানুষ কি শুধু রুটিতে বাঁচতে পারে ? এর উত্তরে, শাহ্-এর স্বৈরাচারী শাসনামলের ইরানীদের বেলায় যতটা বলা যায়, তা হচ্ছে একটা জোরালো 'না'। তারা তাদের দেশের শাসনকার্য পরিচালনায়

একটা দায়িত্বশীল অংশ পেতে চেয়েছিল। তারা শুধু পেট ভরে খেতে পাওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারছিল না। তাদের আত্ম-সম্মান ও মর্যাদা লাভের আকাংখা, তাদের একটা অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও নির্যাতন-মূলক শাসন ব্যবস্থার কবল থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের ব্যাকুলতা তাদেরকে দারুণ অবাধ্য ও অস্থির করে তুলেছিল। এবং এই পরিস্থিতিটা প্রচন্ড একটা রক্তাক্ত বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল সম্পূর্ণরূপেই।

প্রকৃতিগতভাবে এই অনিবার্য বিপ্লব যদি মুলতঃ, ইসলামী চরিত্রের না হতো, তাহলে এটা হতো একটা কম্যুনিস্ট বিপ্লব, এবং তা আরও বেশী রক্তাক্ত, এবং আরও বেশী মারাত্মক হতে পারতো। এই ভূমিকম্প (আন্দোলন), যা ইরানকে উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রকম্পিত করে তুলেছিল, ওলট-পালট করে দিয়েছিল, তা ছিল বহুদিনের রাজনৈতিক নির্যাতন, মৌলিক মানবাধিকারের লঙঘন, বিবেকের স্বাধীনতা হরণ এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের একটি বৃহৎ শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ইরান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল যে, শাহ্-এর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে পিছন থেকে পূরোপূরিভাবে সাহায্য করছে, সমর্থন দিচ্ছে এবং অনুমোদন দিচ্ছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার। কাজেই, জনগণের ঘৃণা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা শাহ্-এর শাসনকে উল্টিয়ে ফেলেই ক্ষান্ত হয় নি, তা রাজতন্ত্রকে রক্ষার স্বার্থে যে সমস্ত শক্তি কোন না কোনভাবে সহায়তা করেছিল, সেগুলির প্রত্যেকটিকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল।

আমেরিকান সমর্থনের সচেতনতা শাহ্-এর মধ্যে নিকৃষ্ট সার্বভৌম স্বৈরতান্ত্রিক প্রকৃতির জন্ম দিয়েছিল। প্রথমদিকে তাঁকে ভয় করা হতো, কিন্তু পরে ক্রমান্বয়ে সেই ভয় সন্ত্রাসে রূপান্তরিত হয়। সময়ের ব্যবধানে বিদ্রোহের ভয় তাঁর মনোভাবকে আরও বেশী কঠোর করে তুলে। ক্রমে ক্রমে একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হয় ইরান। সময় গড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ইরানীরা এটা বুঝতে পারে যে, এই পুলিশী রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র (ইউ.এস.এ) সরকার। শাহ্ মাত্র একটা পুতুলের ভূমিকাই পালন করছেন, এবং তার সুতোগুলো বাঁধা আছে যুক্তরাষ্ট্রের সূক্ষ্ম সুচতুর ও দক্ষ আংগুলগুলোতে। এটাই, যেমনটা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সৃষ্টি করেছিল সেই ঘৃণার সর্বগ্রাসী আগুন জ্বালানো বিপ্লবের মোক্ষম পরিস্থিতি।

এই পরিস্থিতিটাকে পুঁজি রূপে কাজে লাগান আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী। খোমেনী যে মতাদর্শ পেশ করেন এবং যদ্বারা তিনি তাঁর বিপ্লবের চেহারায় রঙ লাগান, তা হচ্ছে শিয়া ইসলাম। কিন্তু, সত্যিই কি শিয়া ইসলামের প্রতি যে ভালবাসা, তা-ই ইউ. এস. এর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করেছিল, না কি ইসলামের নামকে সামনে রেখে তার আড়ালে আসল উদ্দেশ্যকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ? খোমেনী যদি ইসলামের পতাকা না উড়াতেন, তাহলে কি অন্য আর কোন নামে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারতো ? এটা কি সত্য নয় যে, খোমেনী যদি পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ না করতেন এবং এটাকে একটা ইসলামী রঙ ও রূপ না দিতেন, তাহলে কি একই ঘৃণার পরিস্থিতিকে সমভাবেই ব্যবহার করতে পারতো না কোন অ-ধর্মীয় (নন্ রিলিজিয়াস) দর্শন যেমন, জাতীয়তাবাদ কিংবা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ ?

বস্তুতঃ, খোমেনী যাবতীয় সেই শক্তিকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন, যে শক্তিগুলো তাঁরই অনুসরণে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, এবং যারা সময় পেলে তাঁকে এবং লক্ষ্যকেও অতিক্রম করে এগিয়ে যেত। এ কারণেই, ইরানের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও ঘোলাটে হয়ে ওঠেছিল। বিপ্লবের প্রেরণা কম্যুনিজম বা কোন বামপন্থী দর্শনের বিরুদ্ধে ছিল না; বরং তা ছিল শাহ্ এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে। যেহেতু, বিপ্লবের গতিধারা খোমেনীর হাত থেকে বামপন্থী নেতৃত্বের হাতে চলে যাওয়ার একটা প্রকৃত সম্ভাবনা ছিল, সেহেতু খোমেনীকে একই সঙ্গে, তিনটি ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়েছিল। শাহ্কে সিংহাসনচ্যুত করার পর, তিনি শুধু ভূতপূর্ব শাহের সমস্ত সমর্থককেই উৎখাত ও ধ্বংস করে দেননি, আমেরিকার প্রভাবকও উপরে ফেলেছিলেন, এবং এ ব্যাপারে কোথাও কোন সন্দেহের লেশ রাখেন নি। কেননা, এ স্বয়ং বামপন্থী মতাদর্শকেই সমর্থন দিতো এবং তাকে অপ্রতিহতভাবে বাড়তে দিলে, তা খোমেনীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইসলামিক মতাদর্শের পরিবর্তে মার্কস্বাদ–লেনিনবাদ কায়েম করতো।

আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর সৌভাগ্য যে, তিনি শুধু আমেরিকান ডানবাদ (Rightism) -এর বিরুদ্ধেই নয়, রাশিয়ার বামবাদ (Leftism) -এর বিরুদ্ধেও তাঁর ইস্লামিক মতাদর্শের দু'ধারি তরবারি চালাবার মত যথেষ্ট চতুর শক্তিশালী ছিলেন।

যখন সব কথা বলা হলো এবং সব কাজ হয়ে গেল, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে, একটা আর যা-ই থাক এটা ইসলাম ছিল না, যা কিনা ইরানী

বিপ্লবকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং পরিচালিত করেছিল। খুব বেশী হলে, আপনি যদি একটা কিছু বলতেই চান, তাহলে ইরানে যা ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে, সেটাকে আপনি বলতে পারেন খোমেনিজম (খোমেনীবাদ)। আসল যে শক্তিগুলো কাজ করছে, সেগুলোর প্রকৃতি না সত্যিকারভাবে ইসলামী, না মূলগতভাবে ইসলামী। বস্তুতঃ, শাহ্-এর বিরুদ্ধে ইরানীদের প্রতিক্রিয়াকে ব্যবহার করেছে রাজনৈতিক শক্তিগুলো স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে।

বিদেশী বিভিন্ন প্রকার শক্তির অধীনে শোষণের ও দাসত্বের বিরুদ্ধে ইরানীয়ান সচেতনতার এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ইরানীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও, এই সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, ইরানীরা তাদের মাতৃভূমি আরবদের দ্বারা বিজিত হওয়ার ঘটনাকে কখনই ভুলতে পারেনি; ক্ষমা করতে পারেনি। যদিও, ক্ষতস্থানগুলো বহু পূর্বেই সেরে ওঠেছে বলেই মনে হয়, এবং যদিও অনেক শক্তিসম্পন্ন উপাদান যেমন, ধর্মীয়ভাবে অভিন্ন জনসাধারণ, অপরাপর দেশের প্রতি অভিন্ন শত্রুতা, আরব ও ইরানীদেরকে একত্র রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তবু এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ইরানীদের উপরে আরবদের কয়েক শতাব্দীর শাসনের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ তা এখনও ভেতরে ভেতরে বিরাজমান রয়েছে। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রাক-ইসলামী যুগে ইরান এমন একটি শক্তিশালী ও বৈচিত্রময় সভ্যতার অধিকারী ছিল, যার জন্যে সে গর্ব করতে পারতো, ইসলামের সূচনাকালে আরবরা মাত্র দু'টো বিশ্বের খবর রাখতো—একটি পাশ্চাত্যেঃ রোমান সাম্রার্জ্যের অধীনস্থ বিশ্ব; অপরটি প্রাচ্যেঃ ইরানের খসরুদের দ্বারা শাসিত বিশ্ব। দূর অতীতের গৌরবময় সেই স্মৃতি যদিও ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের শক্তিশালী প্রভাবের দ্বারা অনেকাংশে চাপা পড়ে গেছে, তবু তা সম্পূর্ণরূপে মুছে যায় নি। সেই মহান ইরানী সভ্যতা ইরানী বুদ্ধিজীবীদের হৃদয়ে সুদীর্ঘকাল ধরেই ছায়াপাত করে চলেছে।

আরব-ইরানী বিবাদের দীর্ঘ ইতিহাস এবং আরবের ভিতরে ইরানীদের শাস্তিমূলক অভিযানসমূহ আরবদের মনেও যে বিশ্রী ও বিরক্তিকর ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে তা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নিরাময়কারী সময়ও মুছে ফেলতে পারে নি। এবং এটাই মানুষের জন্যে স্বাভাবিক। সারা পৃথিবীতেই দেখা যায়, মানুষের পক্ষে অনেকসময় অতীত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং তাদের সম্মানের

প্রতি আঘাত ও অমর্যাদাকে ভুলে যাওয়াটা কঠিন হয়ে পড়ে। ইতিহাসের এই সব অধ্যায় কখনই চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় না, বরং তা বারবার উন্মোচিত হয়।

অতীতের আরব–ইরানী বিবাদের উল্লেখ তো যথেষ্টই করা হলো। এখন আমরা অতি আধুনিক সময়ের দিকে নযর ফেরাতে চাই। ইরানীরা যে কেবল আরবদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ ও ক্ষোভ পোষণ করতো, তা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, ইরানীদেরকে বৃহৎ বৃটিশ সেনাবাহিনীর অতি নিকৃষ্ট ধরনের শাসনের কবলে আনা হয়েছিল। পক্ষান্তরে, আরবদের বেলায়, অন্ততঃ, অভিন্ন কৃষ্টি ও ধর্মীয় বন্ধনের একটা ত্রাণকারী উপাদান ছিল। বৃটিশদের ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার ব্যবধানটা কমে আসার পরিবর্তে বেড়েই চলছিল এবং এই ব্যবধানটা অনুরূপ কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা ধর্মীয় উপাদানের দ্বারা কমিয়ে ফেলাও সম্ভব ছিল না।

বৃটিশ কর্তৃত্ব ও প্রভাবের পতনের পর, বড় বড় শক্তিগুলো কর্তৃক তাবেদার ও পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপরে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও দমনের যুগ সূচিত হয়। নব্য-সাম্রাজ্যবাদের এই সময়ে ইরানী আশ্রিত বালকটিকে বৃটিশের কোল থেকে আমেরিকার কোলে তুলে দেওয়া হয়। এ করেই ইরানের শাহ্ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতীকে পরিণত হয়। যে সাম্রাজ্যবাদ সমর্থন করেছিল পরস্পরবিরোধী নানান মতাদর্শকে নিজের স্বার্থেই, যেমনটা সে আজও করে চলেছে পোলাণ্ডে, নিকারাগুয়ায়, ইসরাঈলে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়।

যে ঘৃণার আগুন আখেরে খোমেনিয়ান বিপ্লবের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল তা শুধু আমেরিকার উৎপীড়নের ফল নয়, তা বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছিল ঠিক ভুগর্ভস্থ তেল ও গ্যাসের খনির মতই। গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয়, তা হচ্ছে, এই ঘৃণা আসলে, কোনভাবেই ধর্মীয় ছিল না। এই ঘৃণাকে খোমেনী যদি ইসলামের নামে ব্যবহার না করতেন, তাহলে নিশ্চয় কিছু কম্যুনিস্ট নেতা এটাকে ব্যবহার করতো সামাজিক সুবিচারের নামে। ধর্মীয় অ-ধর্মীয় যে নামেই এই বিপ্লবকে আখ্যায়িত করা হোক না কেন, এর অন্তর্নিহিত শক্তি ও উপাদান অভিন্ন।

যারা মনে করে যে, খোমেনী তাঁর নিজের লোকদের অনেকের বিরুদ্ধে যে সব কঠোর বাড়াবাড়ি করেছেন এবং অন্যান্য অনেক দেশের বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিশোধমূলক ক্রিয়াকান্ড চালিয়েছেন তা সবই ছিল ইসলামী চরিত্রের, তাদেরকে আমি বহুবার দেখিয়ে দিয়েছি যে, এই সমস্ত ইরানী অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে ধর্ম হিসেবে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। একভাবে একথাও বলা যায় যে, পাশ্চাত্যের উচিত আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীকে তাদের শত্রু না ভেবে, বরং পৃষ্ঠপোষকরূপেই গণ্য করা। আমি একথা এজন্যই বলছি যে, আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে, খোমেনী যদি পরিস্থিতির সুযোগ না নিতেন এবং তাকে মুসলিম মোল্লাগোষ্ঠীর একটা জান্তার সমর্থনে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে যদি একটা ইসলামী চেহারা না দিতেন, তাহলে তা নিশ্চিতরূপেই বামপন্থী ইরানী নেতাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো। ফলে, যে ইরানকে আজ আমরা সবুজের উপরে লাল রঙ ছিটানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, তার সারাটাই লালে লাল দেখতে পেতাম। একথা বলাটা নিতান্ত হাস্যকর হবে যে, ডঃ মুসাদ্দেক যে কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব সংগঠিত করেছিলেন এবং ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তা শাহ–এর সিংহাসনচ্যুতির সময় এতই দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল যে, তা ইরানের ইতিহাসের এই যুগান্তকারী পরিবর্তনের সময় কোন কার্যকর ও বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম ছিল না। বস্তুতঃ, কম্যুনিস্ট নেতৃত্বকে খুব ভালভাবেই সমর্থন দেওয়া হয়েছিল, এবং ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। এবং তা সুযোগ গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু, তারা তা পারেনি আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর জন্য, নইলে ইরানে একটা কট্টর মার্কসপন্থী শাসন কায়েম হয়ে যেতো। তেমনটা হলে, তা হতো মধ্য-প্রাচ্যের তেল-সমৃদ্ধ কিন্তু সামরিক দিক থেকে দুর্বল দেশগুলোর জন্য একটা সর্বনাশা ঘটনা। অতএব, খোমেনিয়ান ইসলাম, প্রতীচ্যের দৃষ্টিতে তা যতই শুষ্ক ও বিরক্তিকর প্রতীয়মান হোক না কেন, তা তাদের জন্য হয়েছিল শাপে বর। এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা উচিত আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর ভূমিকাকে।

এই আলোচনায় ইরাক-ইরান যুদ্ধের কথা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু এই ঘটনা ইসলামী বিশ্বের একটা অংশের বিস্ফোরনুখ ঘটনাবলীর প্রকৃতির উপরে বেশ খানিকটা আলোকপাত করে। দু'টো দেশই দাবী করে যে, তারা মুসলিম, এবং তারা উভয়ে এই দাবীটাও করে যে, তারা একে অপরকে ঘৃণা

করবার, ধ্বংস করবার এবং নিশ্চিহ্ন করে দেবার প্রেরণা লাভ করেছে নাকি ইসলাম থেকেই।

ইরানী পক্ষের যে সকল সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের সবাইকে মহান শহীদ বলে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে ইরাকী সংবাদ মাধ্যমগুলোতে। এবং ইরাকীদের হাতে যে সমস্ত ইরানী সৈন্য নিহত হয়েছে, তাদেরকে ঐ সব ইরাকী গণমাধ্যম কাফের আখ্যায়িত করে সরাসরি জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঠিক একইভাবে, একই কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে দিনে-রাতে, সীমান্তের অপর পারে, ইরানে। যখনই কোন ইরাকী সৈন্যকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়েছে তখনই সেখানে যুদ্ধক্ষেত্র প্রকম্পিত করে শ্লোগান উঠেছে 'আল্লাহু আকবর'– (আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ)। কোন পক্ষে ছিল ইসলাম ? তাজ্জবের কথা ! এতে বরং, তাদের শ্লোগানের অন্তঃসারশূন্যতাই প্রকটিত হয়ে ওঠেছে। তবে, একটা বিষয় এতে সন্দেহাহীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে, এবং তা হচ্ছে, ইরাকী ও ইরানী সৈন্যরা যারা, দৃশ্যতঃ, একটি মহৎ উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, তারা সবাই প্রতারিত হয়েছে তাদের নেতৃত্বের দ্বারা। ইসলাম এখানেও ছিল না, সেখানেও ছিল না।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

> "যারা ঈমান এনেছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের পক্ষ থেকে (শত্রুকে) প্রতিহত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না বিশ্বাসঘাতককে, অকৃতজ্ঞকে।"
>
> "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করবার) অনুমতি দেওয়া হলো। কারণ, তাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।"
>
> "যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এই কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে যে, তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক।' আল্লাহ্ যদি এই সমস্ত মানুষের একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যার মধ্যে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলা হতো। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্

তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁর (ধর্মের পথে) সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী।" (আল্ হাজ্জ–২২ঃ ৩৯–৪১)

"...............যখনই তারা সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করে তখনই আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করে দেন। এবং তারা পৃথিবীতে ফাসাদ (বিশৃংখলা) সৃষ্টি করার জন্য দৌড়ে বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।" (আল্ মায়েদা – ৫ঃ৬৫)

"এবং যদি মুমিনদের দু'টি দল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীসাংসা করাবে, যদি (মীমাংসার পরেও) তাদের একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করে আক্রমণ করে, তাহলে তোমরা সকলে মিলে যে বিদ্রোহ করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, যদি সে ফিরে আসে তাহলে তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করিয়ে দিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।"

"নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর, এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমাদের উপরে রহম করা হয়।" (হুজুরাত-৪৯ঃ১০,১১)

কোরআন করীমের এই শিক্ষাকে যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধরত জাতিগুলি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে। মক্কা শরীফে হজ্জের সময়ে যে সকল হজ্জযাত্রী এসেছিলেন তাঁদের মাধ্যমে খোমেনিয়ান বিপ্লবের বাণী সমগ্র মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা নিয়েছিল ইরান। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই সকল প্রচেষ্টা অত্যন্ত বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল; এতে দারুণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিল মুসলমানরা। দৃষ্টান্তরূপ, মক্কায় ১৯৮৭ সালে হজ্জের সময়ে, যা ঘটেছিল এবং তার বিরুদ্ধে সৌদী আরব যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, তা সবই পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। পবিত্র কোরআন, অবশ্য, এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে যে শিক্ষা দেয়, তা হচ্ছে ঃ

"কিন্তু তোমরা মসজিদুল হারামের (মধ্যে এবং তার) নিকটে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এটাই কাফেরদের জন্য সমুচিত প্রতিফল।" (আল্-বাকারা– ২ঃ১৯২)

একটা লাভ, অবশ্য, হয়েছিল সব বৃহৎ শক্তিগুলোর (যারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সাহায্য করে চলেছে ইসরাঈলকে, এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র) খোমেনী ও খোমেনিজমের কল্যাণে, এবং তা হচ্ছে, ইরাক-ইরান যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করা ছাড়া খোমেনীর আর দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। এবং এটাই মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টিকে ইসরাঈলের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ইস্যুর উপরে নিবদ্ধ করতে পেরেছিল। অথচ, এই ইসরাঈলই হচ্ছে তাদের পাশে সব চাইতে বিরক্তিকর একটা কাঁটা। একটি বহিঃশত্রুর হুমকীর প্রতি যে সচেতনতা, তারই পরিবর্তে সেখানে স্থান করে নিল এক মুসলমানের প্রতি আর এক মুসলমানের ক্রমবর্ধমান অনাস্থা।

মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্বটাকে খণ্ড–বিখণ্ড করে ফেলা হয়েছে। ইসরাঈলের 'ভীতি'টাকে একটা তুচ্ছ ও সুপ্ত বিপদ হিসেবে তাকের উপরে তুলে রাখা হয়েছে পরে দেখা যাবে বলে। মুসলমানদের একটা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরেকটার যে 'ভীতি', সেটাকে দেখা হয়েছে অনেক অনেক বড় করে, এবং সেটাই আগে জরুরী ভিত্তিতে মিটিয়ে ফেলা দরকার বলে বিবেচনা করা হয়েছে। বহিঃশত্রুর ভীতি, তা সে বাস্তবই হোক আর কাল্পনিক হোক, তা ভুলে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য, (বিবদমান) উভয়পক্ষই, সাধারণ সৈনিকদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, প্রায়শঃ, যে শ্লোগান দিয়েছে, তা হচ্ছে, ইসলাম বিপদাপন্ন। প্রকৃত প্রস্তাবে, যা ঘটে চলেছে, তা হচ্ছে, আরব ও ইরানী 'আজম'দের (আজম অর্থ – অনারব, বিদেশী) মধ্যেকার ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষের পুনর্জাগরণ। এটা কোন ইসলামিক বনাম অন–ইসলামিক শক্তি কিংবা শিয়াইজম বনাম সুন্নীইজমের প্রশ্ন নয়। এটা বরং, হাজার বছরের বৈরিতার সরাসরি প্রত্যাবর্তন। এবং এজন্যই যে সকল আরব পূর্বে ইরাক ও সৌদি আরবের সমালোচনায় মুখর ছিল, তারাও পরে অপরিহার্য কারণেই ইরাকের পক্ষাবলম্বন করেছে। এটা আসলে ইরানের

ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ ও হুমকীর মোকাবেলায় আরবদের স্রেফ একটা উদ্বর্তনের ব্যাপার।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, আরবরা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েও আন্তঃগোত্রীয় কলহ–ফাসাদে লিপ্ত হতো এবং তা দীর্ঘদিন ধরে চলতো। ইসলাম এটার উপরে সমাপ্তি টানে। ইসলাম মুসলমানদেরকে সর্বপ্রকারের বৈরিতা ও ভেদাভেদহীন এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু মুসলমানরা যখন ইসলামের শিক্ষা বিসর্জন দিয়ে জীবন যাপন করা শুরু করলো, তখন ভাই শত্রুতে পরিণত হলো, এবং গোত্রীয় বিবাদ পুনরায় সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো। সুতরাং, আজ ইসলামী বিশ্বে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা চারিত্রিকভাবে ইসলাম নয়। এ হচ্ছে, প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতাসমূহের আর এক উত্থান।

বৃহৎ শক্তিগুলো পুরাদস্তুর যুদ্ধের নিন্দা করতো এবং বার বার যুদ্ধ বন্ধ করার দাবী জানিয়েছে, কিন্তু তারাই তো নিজেরা দায়ী ছিল ইরাক ও ইরানের কাছে অহরহ সমরাস্ত্র সরবরাহের জন্য। আর যাই হোক, যুদ্ধ-বিমান, রকেট, ক্ষেপণাস্ত্র, কামান, ট্যাঙ্ক, আর্টিলারী, যানবাহন, এবং অন্য সব ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র যা অবাধে ব্যবহার করেছে যুদ্ধরত উভয় পক্ষই, তা তো আর তাদের স্বদেশে তৈরী হয় নি। গোপনেই হউক প্রকাশ্যেই হোক মধ্যপ্রাচ্যের তেলের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সমরাস্ত্র অদলবদল হয়েছে। একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখলেই পরিষ্কার দেখা যাবে যে, যুদ্ধের যে আগুন জ্বলছিল, তা আসলে জ্বলছিল ইরাকী ও ইরানী তেলের দ্বারাই, যে তেলকে সমরাস্ত্রে রূপান্তরিত করেছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অমুসলিম শক্তিগুলো। পাশ্চাত্যের জন্য ব্যবসাটা কোনভাবেই খারাপ কিছু ছিল না। তারা তো মধ্য প্রাচ্যের তেল খরিদ করতো তাদের সব বস্তা পচা বাতিল এবং সেকেলে হয়ে পড়া অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময়ে। এর চাইতে ভাল ব্যবসায় আর কী হতে পারে!

এবং আমরা দেখেছি যে, চিরশত্রু ইসরাঈলকেও সম্পূর্ণরূপে ভুলেই যাওয়া হয়েছিল। মুসলিম বিশ্বের তেলকে কাজে লাগানো হয়েছিল মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। পূর্ববর্তী কয়েক দশকের কষ্টসাধ্য উন্নয়নকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছিল। অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ ধরে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার পরিবর্তে, ইরাক ও ইরান উভয়েই পশ্চাৎ মুখে যাত্রা শুরু করেছিল।

অবশ্য, সকল যুদ্ধই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পার্থিব ও মানব-সম্পদ, সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং শিল্প-কারখানার উপরে ব্যাপক ধ্বংসলীলার স্বাক্ষর রেখে যায়। কিন্তু, উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে, যুদ্ধ-শিল্প তাদের নিজেদের ও মিত্রদের সম্পদের সহায়তার পুনর্গঠিত হতে পারে। যুদ্ধের চাহিদা ও চাপ এবং উদ্বর্তনের জন্য সংগ্রামের দরুন তাদের সম্পদ নষ্ট হলেও, এর দ্বারা তাদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কলা-কৌশলগত জ্ঞানও বৃদ্ধি পায় অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে। যুদ্ধের সময়ে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করা হয়, তা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিকে শুধু পুনর্বাসিত করা হয় না, তা বরং দারুণভাবে তেজী করেও তোলা হয়। ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পরে, নতুন নতুন গঠনমূলক ধারণারও জন্ম হয়, এবং তা বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-কারখানার উন্নতিসাধনে অগ্রগতি এনে দেয়। সুতরাং, একটা দীর্ঘায়িত যুদ্ধের ফলে দুর্বল হয়ে পড়লেও তা একটা দেশের আরও বেশী উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে সহায়কও হতে পারে।

কিন্তু, আফসোস যে, এই অবস্থাটা সেই সব বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য হয় না, যারা যুদ্ধ করার বিলাসিতায় অযথা লিপ্ত হয়ে পড়ে তাদের একমাত্র উপায় থাকে, তাদের যা কিছু আছে তা সবই বিক্রি করে দেওয়া এবং, এমনকি, বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক দিক দিয়ে উন্নত দেশগুলোর কাছে যুদ্ধ-সামগ্রী সরবরাহ করার শর্তে বন্দোবস্ত করে তাদের ভবিষ্যতকে পর্যন্ত বন্ধক রেখে দেওয়া। এটা করা ছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষে কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কোনমতেই সম্ভব নয়। বিশেষতঃ, তা যদি হয় দীর্ঘায়িত ও ধ্বংসাত্মক কোন যুদ্ধ, যেমনটা হয়ে গেল ইরাক্ ও ইরানের মধ্যে। এই দেশগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধেও যে যুলুম ও নির্যাতন চালিয়েছে বা চালায় তার দায়িত্ব সেই সকল দেশের স্কন্ধেও, খানিকটা হলেও, বর্তায়, যারা তাদের কাছে যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ-সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে।

সব কথা বলাই যখন শেষ হবে, যখন সব কিছুই করা হয়ে যাবে, দেনাপাওনা মিটমাট হবে, এবং জিনিষপত্রের লেনদেনের ও হিসাবাদি হয়ে যাবে, তখন একটা প্রশ্নের বিবেচনা করাটা, সম্ভবতঃ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা

দিবে যে,আখেরে এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের সুবিধাভোগী বা বেনিফিশিয়ারী কে বা কারা?

আমরা দেখেছি যে, ইসলামের নিন্দা করা হচ্ছে বর্বর ধর্ম বলেঃ বলা হচ্ছে যে, এই ধর্ম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে, ঘৃণা এবং অসহিষ্ণুতার প্রচার করে, এবং নিজের অনুসারীদেরকে এমনভাবে ভাগ ভাগ করে ফেলে যে, তারা একে অপরের রক্তপিপাসু শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়। এটা কোন আশ্চর্যজনক কথা নয়। কারণ, এথেকে তারা একটা প্রান্তিক সুবিধাও পেয়ে যায়, তাদের পরিকল্পনা ও চক্রান্ত কার্যকর করবার এবং ধ্বংস করার জন্য অস্ত্রশস্ত্রের জোগান দেওয়ার এই মুসলিম উম্মাহ্‌র হতভাগ্য যুদ্ধরত দলগুলোর কাছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদ' কথাটা থেকে আর একটা মজার কথা উদ্ভাবিত হয়েছে, এবং তা গত দশকে চয়ন করেছে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলো, কথাটা হচ্ছেঃ 'ইসলামিক আণবিক বোমা'। বলা হয় যে, পাকিস্তান এই বোমার অধিকারী। অবশ্য, 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ' বলতে যদি কোন কিছু থেকে থাকে, তাহলে 'ইসলামিক আণবিক বোমা' থাকাও তো দরকার। এটাও বিচিত্র কিছু নয় যে, বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধের জন্য উপযোগী বিভিন্ন কথাও (টার্ম) অতঃপর, যোগ করে দেওয়া হবে 'ইসলামিক' শব্দটির সাথে। কিন্তু, আমরা কি এমনটা কখনও শুনেছি যে, খৃষ্টান আণবিক বোমা, ইহুদী আণবিক বোমা, হিন্দু আণবিক বোমা, বর্ণবৈষম্য বোমা কিংবা শিন্টো বোমা ? তাজ্জবের ব্যাপার হচ্ছে, আরও হাজারো রকমের 'ধর্মীয়' বোমা বলার জায়গা থাকলেও, পাশ্চাত্য গণমাধ্যমগুলো, বিশেষভাবে সনাক্ত এবং তিরস্কার করার জন্য, বাছাই করে নিয়েছে একটা ইসলামিক বোমাকেই – যে বোমার অস্তিত্বই কিনা সন্দেহজনক।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আসল যে শক্তিগুলো কাজ করে যাচ্ছে সেগুলোর কোনটারই চরিত্র কোনভাবেই মূলতঃ ধর্মীয় নয়। তাহলে, অধুনা যখনই কোন মুসলিম দলে উপদলে বা দেশের কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত হতে দেখা যায়, তখনই কেন সেটাকে 'ইসলামিক' বলে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় ? যে শক্তিগুলো সারাক্ষণ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিত করে ইরাক-ইরান যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করেছিল, যার দরুন ধন-সম্পদের অপরিমেয় ক্ষয়–ক্ষতি সাধিত হয়েছে, অগণিত মানুষের প্রাণ নাশ হয়েছে, মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়েছে, তার দায়িত্ব কি তারা এড়াতে পারে ? তাদের আড়ালের উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেন, তাদের কাজ–কর্মের দ্বারা কেবল খোমেনিইজমকেই টিকে

থাকতে সাহায্য করা হবে। যুদ্ধরত দেশগুলোকে যদি তাদের নিজেদের সামর্থ্যের উপরেই দেওয়া হতো, তাহলে খোমেনিইজম তখনই পতনের দিকে ধাবিত হতো।

অন্য সব কিছুর মধ্যে, এই যুদ্ধ ইরানীদের মধ্যে একটা জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থান ঘটিয়েছিল এবং তা শক্তিশালীও করেছিল, যা কিনা ইরানীদের দৃষ্টিকে অভ্যন্তরীণ সমস্যাদির উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে একটা বহিঃশত্রুর হুমকীর প্রতি নিবদ্ধ করেছিল। যুদ্ধ না ঘটলে, খোমেনিইজমের মাত্রাতিরিক্ত অসহিষ্ণুতা ও কট্টর সংস্কার থেকে ইরানীদের মোহমুক্তি ঘটতে পারতো আরও বেশী দ্রুততার সঙ্গে। ইরানের অভ্যন্তরে বিপ্লবের মূল্যবোধগুলির যথার্থতা নিরূপণ করার এবং তার ভাল ও মন্দের বিচার করার একটা জোরালো প্রবণতা রয়েছে। যদিও এলিট বা সমাজের সেরা শ্রেণীর একটা বড় অংশকেই উৎখাত করা হয়েছে, তবু যে বুদ্ধিজীবীরা টিকে গেছেন তাঁরা খোমেনিয়ান বিপ্লবের লাভ-লোকসানের হিসাবটা আর একবার না কষেই পারেন না। ইরানের জন্য একটা নতুন ব্যবস্থার সন্ধান করাটা এখন, বলা যায়, আসন্ন হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ চলাকালে, যুদ্ধজনিত উত্তেজনা ইরানী জনসাধারণের নৈতিক বল চাঙ্গা রাখতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। ইরানের এই নৈতিক বল যখনই শেষ হয়ে যাবে তখনই তা হবে তার জন্য এক মহা অনিশ্চয়তার সময়। বর্তমান সরকারকে যদি কোন বামপন্থী বা ডানপন্থী কিংবা মধ্যপন্থীদের কোন বামঘেঁষা দল অপসারিত করতে পারে, তাহলে প্রাধান্য বিস্তার এবং সরকার গঠনের জন্য একটা বড় ধরনের লড়াই বেঁধে যাবে। অতএব, সব কিছুই আবার সেই জ্বলন্ত কড়ায়েই পতিত হবে, এবং কেউ আর তখন নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে, ইরানের কপালে কী আছে ! আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমি ইরানের জনগণের জন্য শুধু এতটুকুই প্রার্থনা করতে পারি যে, তাদের কঠিন সময়ের পরে যেন একটা শান্তির ও সুখের সময় আসে। তারা অবশ্যই একটা সাহসী জাতি, ভাগ্যবান জাতি। অতীতে তারা অনেক দুর্ভোগ পোহায়েছে এবং এখনও পোহাচ্ছে ইরানী, অ-ইরানী উভয়েরই হাতে। এবং পরিহাস যে, চুক্তির ব্যাপারে তারা এক প্রকার বদনামও অর্জন করেছে। আল্লাহ্ তাদের উপর রহম করুন ! তাদেরকে এই নিদারুণ দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ দান করুন !

এখন আমরা ইরানে খোমেনিয়ান বিপ্লবের আর একটা দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চাই। ক্ষমতায় আসার পর পরেই, আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী শুধু ইরানী মুসলমানদের জীবনযাপন পদ্ধতি বা লাইফ-স্টাইলকে বিদেশীদের প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত করবারই পরিকল্পনা করলেন না, তিনি বরং, একই ধরনের বিপ্লব পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও সংঘটিত করবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তিনি গোটা মুসলিম বিশ্বে প্রচার করে দিলেন যে, তিনি ফিলিস্তীনিদেরকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে এবং জাইঅ্যানবাদী শক্তিকে পরাজিত করার ব্যাপারে আরও বেশী শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবেন। স্পষ্টতঃই, না কোন মুসলিম রাষ্ট্র, না ইসরাঈল, কোন ইরানী দূতকে আগ বাড়িয়ে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত ছিল। সুতরাং, বিপ্লবকে বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালান করা সম্ভব হয়নি। ইরান তার পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোতে তার বিপ্লবের মাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সন্দেহ নেই, সে কিছুটা কামিয়াবী হাসিল করেছে ফিলিস্তীনী-ইসরাঈলী সেক্টরে। আমি ইতোপূর্বে বলে এসেছি যে, এই এলাকাটাতে যে সকল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়, তা সে ইসরাঈলের বিরুদ্ধেই হোক, আর পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেই হোক, তার লাইসেন্স তারা ইসলামের কাছ থেকে পায় নি, পেয়েছে একমাত্র ইরানী বিপ্লবের দর্শন থেকেই।

যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও শক্তি প্রয়োগের যে সব লম্বা লম্বা কথাবার্তা আমরা শুনে থাকি, তা সবই--এই উদ্ভট অবস্থাটার গুরুত্ব বুঝবার আগে-সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। সংকীর্ণ এবং অসহিষ্ণু মনোভাব ইদানীং প্রায় সব মুসলিম দেশের মোল্লাগোষ্ঠীর কাছে ক্রমাগতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর দায়িত্ব প্রধানতঃ বর্তায় সৌদী আরবের স্কন্ধে। সৌদী আরব সারা মুসলিম জাহানের শ্রদ্ধা ও সমর্থন লাভের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এবং তার রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিও বিস্তার করতে চাচ্ছে ধর্মীয় লেবাসের আড়ালে। এ ব্যাপারে তার একটা বিশেষ একক সুবিধাও আছে; কেননা, সে ইসলামের পবিত্রতম দু'টি শহর মক্কা ও মদীনার হেফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত। সুতরাং, এই সুযোগটাকে সে নিশ্চিতভাবেই তার পক্ষে কাজে লাগাবে, যথাসাধ্য।

সৌদীদের ধর্মীয় দর্শনের উৎপত্তি 'ওহাবীজম' বা 'ওয়াহ্হাবী মতবাদ' থেকে। এই মতবাদ তার প্রেরণা লাভ করেছে ইসলামের মধ্যযুগের অসহিষ্ণু বিশ্ব থেকে। এই মতবাদ হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর যামানার অধিকতর সমঝোতা স্থাপনকারী ও উদার ইসলাম থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেনি। এই সৌদী প্রভাব বিস্তারকে সহায়তা দান করছে সৌদী পেট্রো-ডলার, এবং বিশ্বব্যাপী বড় বড় সব ব্যাংকে গচ্ছিত বিপুল বিপুল আয়তনের সৌদী ব্যাংক ব্যালান্সসমূহ। সৌদী আরবের জমার ঘরে গচ্ছিত এই সমস্ত বিশাল পরিমাণের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত

সুদের একটা হিস্যা ব্যবহৃত হয়, সৌদী অ্যারাবীয়ান ধন-ভাণ্ডারসমূহ থেকে, এইড বা সাহায্যের চ্যানেল তৈরীর কাজে এবং তা প্রবাহিত হয়ে যায় মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বা মুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে। এই যে সাহায্য তা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দেওয়া হয় না; বরং তা দেওয়া হয় মসজিদ নির্মাণে, এবং সৌদী ব্রাণ্ডের উলেমা তৈরীর উদ্দেশ্যে স্কুল, মাদ্রাসা ও ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপনের জন্য।

অতএব, যেখানেই আপনি সৌদী সাহায্যের প্রবাহকে অনুসরণ করবেন, সেখানেই আপনি দেখতে পাবেন যে, মোল্লাহ্–মৌলবীদের সংকীর্ণ, অসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্দেহ নেই, যখন খৃষ্টান জগৎ শোনে যে, দিনরাত উচ্চ কণ্ঠে সমস্ত অ-মুসলিম মূল্যবোধকে নিন্দাবাদ করা হচ্ছে, এবং অ-মুসলিম সরকারগুলোর বিরুদ্ধে জেহাদের (ধর্মযুদ্ধের) ডাক দেওয়া হচ্ছে, তখন তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, জেহাদের এই সব হাঁক-ডাক, অবশেষে, রীতিমত যুদ্ধে পরিণত না হয়ে যায় না। কিন্তু, বাস্তবে যা ঘটছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

মুসলিম 'ক্লার্জি' (Clergy) বা মোল্লা–মৌলবীরা বা আলেম–উলেমা অন্য কথায় 'মোল্লাগোষ্ঠী' জেহাদের কথা এবং অন–ইসলামিক শক্তিগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলার কথা খুব জোরে শোরেই বলে থাকেন। আসলে অন–ইসলামিক শক্তি বলতে তাঁরা যা বুঝাতে চান তা, না–খৃষ্টান, না ইহুদী, না বৌদ্ধ, না নাস্তিক। তাঁদের মতে, সকল মুসলিম ফের্কা বা দল, কেবল তাদের নিজেদের ফের্কা বা দল ছাড়া, হয় চারিত্রিকভাবে অমুসলিম, নয়তো এমন সব মতবাদের অনুসারী যার দরুন তারা খোদার এবং খোদার সাধু বান্দাদের গযবে বা ক্রোধে পতিত হয়েছে। ইসলামের প্রকৃত দুষমন, তাদের হিসেবে, কোনও অ-মুসলিম নয়, বরং এই শত্রুরা হচ্ছে ইসলামী বিশ্বের ইসলামেরই ভেতরের কিছু কিছু ফের্কা বা দল–উপদল। মুসলমানদের সেই যুদ্ধংদেহী প্রবণতাকে কোন অ–মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত করার চাইতে অনেক অনেক বেশী করে কাজে লাগানো হচ্ছে এক ফের্কার মুসলমানের দ্বারা আর এক ফের্কার মুসলমানের বিরুদ্ধে। আর এজন্যই তারা ধর্মত্যাগী বা মুরতাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির উপরে এত বেশী জোর দেয়। এটাই হচ্ছে তাদের অস্ত্র, যা তারা প্রয়োগ করতে চায় সেই সমস্ত ফের্কার মুসলমানের বিরুদ্ধে যারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ফের্কার সঙ্গে ধর্মীয় মতবাদ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। এই ফের্কাগুলোকে মৃত্যুর আঘাত হানা হয় দুই ধাপে। প্রথম, তাদের

মতবাদকে ঘোষণা করা হয় অন-ইসলামিক বলে ; যার ফলে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তারা মুরতাদ-ধর্মত্যাগী। দ্বিতীয়তঃ, ইরতেদাদ বা ধর্মত্যাগের শাস্তি যেহেতু, তাদের মতে, মৃত্যুদণ্ড ; সেহেতু তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য।

যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক এ ব্যাপারে একমত হবেন যে, এই ক্রমবর্ধমান যুদ্ধংদেহী প্রবণতা খোদ মুসলমানদের মধ্যেই বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে, এবং এটাই এক ফের্কার অনুসারীদের মনে আর এক ফের্কার অনুসারীদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

এ বিষয়ে অমুসলিম শক্তিগুলো সম্পর্কে যতটা বলা যায়, তা হচ্ছে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করতে পারে এবং একেবারে নিশ্চিত থাকতে পারে যে, মুসলিম বিশ্বের এই তথাকথিত যুদ্ধংদেহী মনোভাবের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোনভাবেই কোন আশঙ্কা নেই। এর একটা বাস্তব প্রমাণ স্বরূপ যে কেউ পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদী আরবের সম্পর্কটা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এটা বিশ্বাস করাই অসম্ভব যে, সৌদী আরব অথবা তার প্রভাবাধীন দেশগুলো ইউএসএ অথবা তার কোন মিত্র দেশের বিরুদ্ধে তরবারি উঠাবার কখনও স্বপ্ন দেখে । সৌদী-শাসন নিজের টিকে থাকার জন্য ইউ. এস. এ-র উপরে শতকরা একশ' ভাগই নির্ভরশীল। এই শাসক-পরিবারটির প্রায় সাকল্য সম্পদই গচ্ছিত রাখা হয়েছে আমেরিকার ও পাশ্চাত্যের ব্যাংকগুলোতে। সর্বোপরি, তাদের ভেতরের এবং বাইরের নিরাপত্তার জন্য পাশ্চাত্যের উপর তাদের নির্ভরশীলতার ব্যাপারটা এত বেশী প্রকট যে, তা আর নতুন করে বলারই অপেক্ষা রাখে না। মাত্র এ দু'টো বিষয়ই এ ব্যাপারে গ্যারান্টি যে, না সৌদী আরব, না তার প্রভাবাধীন কোন মুসলিম রাষ্ট্র অমুসলিম পাশ্চাত্যের জন্য কখনও কোন হুমকীর সৃষ্টি করতে পারবে। তদুপরি, এটা তো জানা কথাই যে, কোন একটা মুসলিম রাষ্ট্রও বর্তমানে এমন নেই যে, সে তার যুদ্ধ-সামগ্রী উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এবং আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রমণমূলক প্রয়োজনে তারা সবাই নির্ভরশীল হয় প্রতীচ্যের উপরে, নয়তো প্রাচ্যের উপরে। এবং এটাই তো যে কোন গ্যারান্টির চাইতে অনেক বেশী যে, তারা অমুসলিম শক্তিগুলোর সঙ্গে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ আচরণ করতে বাধ্য। একই কথা লিবিয়া এবং সিরিয়ার মত দেশগুলোর জন্যেও প্রযোজ্য, এরাও পাশ্চাত্যের সঙ্গে ততটা না হলেও প্রাচ্যের শক্তিগুলোর সঙ্গে অনুরূপ সৌহার্দমূলক সম্পর্কই বজায় রেখে চলে।

বর্তমান যুদ্ধ–বিগ্রহ সম্পর্কে যার সামান্য কিছু জ্ঞানও আছে , সে–ও এটা কল্পনা করতে পারবে না যে, তথাকথিত 'ইসলামিক' যুদ্ধংদেহী মনোভাব থেকে কোন দেশের সত্যিসত্যিই কোন বিপদের আশংকা আছে। অবশ্য, এই জাতীয় ক্রমবর্ধমান মনোভাব থেকে এক প্রকার বিপদের আশঙ্কা রয়েছে, এবং সেদিকটার কথা ভাবলে যে কেউ বিব্রত বোধ না করে পারবেন না। এবং সেই বিপদটা হচ্ছে, এই যুদ্ধংদেহী প্রবণতাটা খোদ ইসলামী বিশ্বের জন্যই বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে।এটা একটা অন্তর্মুখী হুমকী, যা কিনা সর্বত্রই মুসলিমদের শক্তি নষ্ট করছে। সকল ধরনের অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণচিত্ততা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি, যা আমরা আজকের মুসলিম বিশ্বে দেখতে পাচ্ছি, তা মুসলিম জাহানের শান্তিকে সম্পূর্ণরূপে বরবাদ করে দিচ্ছে। আহা ! সত্যি বলতে কি, আমি এ ব্যাপারে সচেতন যে, 'সন্ত্রাসবাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয় সব রকমের ত্রাস সৃষ্টি, বোমাবাজি ইত্যাদির ক্ষেত্রে। কিন্তু, আমি এটা বিশ্বাস করি না যে, এই শ্রেণীর কার্যকলাপই একমাত্র সন্ত্রাসবাদ যদ্দরুন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে গোটা দুনিয়াটা। আমি বিশ্বাস করি যে, যখন কোন সরকার তার দেশবাসীর মতবিরোধকে চাপা দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যে সব নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলোকেও 'সন্ত্রাসবাদ' কথাটার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আমি মনে করি, একটা দেশের সরকার কর্তৃক সেই দেশের, বাম ডান যা–ই হোক, জনগণের বিরুদ্ধে গৃহীত্ব নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাগুলো হচ্ছে নিকৃষ্ট ধরনের 'সন্ত্রাসবাদ'। যখন বিদেশী কোন সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ চালানো হয়, এবং সে জন্য এখানে সেখানে বোমাবাজি করা হয়, প্লেন ছিনতাই করা হয়, তখন সেই ঘটনাগুলি প্রায় সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সমস্ত নিষ্ঠুর সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের শিকারে যারা পরিণত হয়, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিশ্বজনমত গড়ে ওঠে, এবং এটা হওয়াই উচিত। এইসব সহানুভূতি শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না ; বরং অনুরূপ ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর ঘটতে না পারে তজ্জন্য প্রতিরোধ ও পূর্ব-সতর্কতামূলক গঠনমূলক ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, কথা হচ্ছে, যে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের সরকারের হাতেই কঠোর ও নির্মম দুর্ভোগের শিকার হয়ে দিন কাটাচ্ছে, তাদের জন্য কি করা হচ্ছে ? তাদের আর্ত চীৎকার বহির্বিশ্বে খুব কমই শোনা হয়। তাদের প্রতিবাদের কণ্ঠ সেন্সরশীপের কঠোর ব্যবস্থার চাপে প্রায়শঃই স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি, জনকল্যাণমূলক সংস্থাগুলো, যেমন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, যদি এই সমস্ত নির্যাতন, অত্যাচার এবং মানবাধিকার লঙঘনের ঘটনার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর যদি সেই সব ঘটনার প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো নিন্দা জ্ঞাপন করে, যদি করেই আদৌ, তবে

তাকে মৃদুই বলতে হবে। এই সকল ঘটনাকে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই, বিবেচনা করা হয় সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে। এগুলোকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ না বলে বলা হয় এবং ব্যাপকভাবেই বলা হয় যে, এগুলো হচ্ছে, সরকারের সন্ত্রাসবাদ দমনের এবং শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, কোন দেশের সরকার যখন সেই দেশের জনগণের কোন জনপ্রিয় আন্দোলন বা কোন সন্দেহজনক বিরোধিতা নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে কোন বিবর্তনমূলক বা দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তখন তা প্রায় ক্ষেত্রেই যথার্থ আইনগত সীমা ছাড়িয়ে যায়, এবং তা সবই সন্ত্রাসবাদী নিষ্ঠুর কার্যকলাপের রূপ পরিগ্রহ করে; কেননা, এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হয় এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যে, এতে যেন অসন্তুষ্ট জনসাধারণের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। এই জাতীয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়ে মানবজাতি যত বেশী দুর্ভোগ পোহায়েছে, তার তুলনায় অন্তর্ঘাত ও ছিনতাই ইত্যাদি সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর দ্বারা সৃষ্ট দুর্ভোগ নিতান্তই কম হবে। এক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে যতটা বলা যায় তা হচ্ছে, ইসলাম সুস্পষ্টরূপে এবং সুনির্দিষ্টভাবে সকল প্রকারের সন্ত্রাসবাদ প্রত্যাখ্যান করে এবং তার নিন্দা করে। এই ধর্ম কোন প্রকারের কোন সন্ত্রাসকে না সাহায্য করে, না সমর্থন করে – তা সেই সন্ত্রাস কোন ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধেই হোক, আর কোনও সরকারের বিরুদ্ধে।

অবশ্য, মুসলিম বিশ্বে এমন অনেক অস্থিরতাপূর্ণ এলাকা আছে, যে সমস্ত জায়গায় দল, সংগঠন, এমনকি, কখনও কখনও সরকারও, মনে হয়, লিপ্ত হয়ে পড়ে সন্ত্রাসবাদ, বিশৃংখলা ও অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকাণ্ডে। এ সব ব্যাপারে, প্যালেস্টাইন, লেবানন, লিবিয়া এবং সিরিয়া প্রায়ই খবরে আসে। অধিকাংশ ঘটনাতেই দেখা যায় যারা জড়িত তারা ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে মুসলমান। তবে, ব্যতিক্রমও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফিলিস্তিনীদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ চালাতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু তারা ধর্মবিশ্বাসে খৃষ্টান। নিজেদের সুবিধার্থে কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো তাদেরকেও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী বলেই চালিয়ে থাকে। লেবাননে মুসলিম সন্ত্রাসবাদী আছে, খৃষ্টান সন্ত্রাসবাদী আছে, সেই সঙ্গে আছে ইহুদী চরেরা ও সৈনিকেরা যারা মাঝে মধ্যেই এমন সব সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকাণ্ড ঘটায়, যা মানুষের আবেগ–অনুভূতিকে সাংঘাতিকভাবে আতংকিত করে তোলে। কিন্তু, আপনি এমন কথা কখনও শুনবেন না যে, লেবাননে যা ঘটছে তার মধ্যে ইহুদী অথবা খৃষ্টান সন্ত্রাসবাদও জড়িত আছে। সমস্ত সন্ত্রাসী ক্রিয়াকাণ্ডকে একত্রে জড়ো করে, বোঁচকা বেঁধে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ'।

সালমান রুশদীর ব্যাপারটাতে তো কোন সুস্থ বুদ্ধির মানুষ, যার কোরআন শরীফের সামান্য কিছু সঠিক জ্ঞান আছে, সে-ও বলতে পারবে না যে, ইমাম খোমেনীর ঐ মৃত্যু–দণ্ডাদেশটা ছিল ইসলামী আইনসম্মত। ব্লাসফেমী বা ঈশ্বরনিন্দার জন্য এরূপ কোনও শাস্তির বিধান নেই কোরআন করীমে এবং ইসলামের পবিত্র নবী (সাঃ)–এর হাদীসে। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ব্লাসফেমী বা নিন্দার কথা বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনে এভাবে ঃ

"এবং তোমরা ওদেরকে গালি দিও না, যাদেরকে তারা
আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে (উপাস্যরূপে) ডাকে, নতুবা তারা
অজ্ঞতার কারণে শত্রুতাবশতঃ আল্লাহ্‌কেই গালি দিবে।"
(আল্ আন্‌আম – ৬ঃ১০৯)

আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ব্লাসফেমী বা নিন্দা করার অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদানের কোনও অধিকার দেওয়া হয়নি কোনও মানুষকে।

যীশু খৃষ্ট (আঃ)-এর মা হযরত মরিয়মের বিরুদ্ধে ব্লাসফেমীর অপরাধ করেছিল ইহুদীরা। এই বিষয়টাকে পবিত্র কোরআন উল্লেখ করেছে এইভাবে ঃ

"এবং তাদের অস্বীকারের (কুফরীর) কারণে এবং
মরিয়মের প্রতি তাদের ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ
আরোপ করার কারণে।" (আন্ নিসা – ৪ঃ১৫৭)

এক্ষেত্রেও, স্বয়ং আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ কোনো প্রকারে শাস্তি দিতে পারবে না বলেই বলা হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃজনক এবং পরিতাপের ব্যাপার যে, ইমাম খোমেনী ইসলামকে সমর্থন করার পরিবর্তে, তাঁর ঐকাজের (মৃত্যু–দণ্ডাদেশের) দ্বারা, ইসলামের কলংক রটনা করেছেন। এবং মুক্ত–বিশ্বে ইসলামের ভাবমূর্তির অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছেন।

আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের (কায়রো) গ্রাণ্ড মস্‌জিদের ইমাম সাহেব ইমাম খোমেনীর ঐ 'ফতওয়া'কে ইতোমধ্যেই নাকচ করে দিয়েছেন। এবং আমি নিশ্চিত যে, এমন সব আরো অনেক শিয়া মুসলমান রয়েছেন যাঁরা এ ব্যাপারে ইমাম খোমেনীর সঙ্গে একমত হবেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও, আসল যে ইস্যু, সেটাকে উপেক্ষা করাটা কোনক্রমেই ঠিক হবে না। আমি মনে করি, সালমান রুশদীর নিন্দা না করে কেবল খোমেনীর

নিন্দা করাটা–যেমন অনেক রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা করেছেন–তা অন্যায়। রুশদী এমন একটা বই লিখেছে যার দ্বারা সে ইচ্ছাকৃতভাবে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমানের মনে চরম ভাষায় আঘাত দিয়েছে। শুধু তাই নয়। এই বইটা মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যেকার শান্তিপূর্ণ সম্পর্কেরও ক্ষতিসাধন করেছে, এবং বইটা সম্পর্কে জাতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোতে যে সমস্ত চিঠি-পত্র প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেগুলোতে যে সমস্ত মন্তব্যাদি করা হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে যে কেউ বলতে পারেন যে, বইটার মাধ্যমে গোত্রীয় বা ফের্কাগত অসহিষ্ণুতার শক্তিগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি এটা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, আমি যে কোন প্রকারের সন্ত্রাসবাদিতাকে কোনভাবেই সমর্থন করি না, তা সেই সন্ত্রাসবাদের বর্ণ, ধর্ম, আবেগ–অনুভূতি অথবা উদ্দেশ্য যা–ই হোক না কেন। ইসলাম আমার ঈমান, আমার ধর্ম। এবং ইসলাম কোন ধরনের বিশৃংখল্যাকেই সমর্থন করে না। ইসলামের অবস্থান সন্ত্রাসবাদী শিক্ষার নাগালের বাইরে। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, কর্ণেল গাদ্দাফির তৈল–ডলারের সাহায্যে যে সন্ত্রাসবাদকে সংগঠিত করা হয়,সমর্থন করা হয়, সেটার ধর্ম তাহলে কি ? তাছাড়া, এতদিন সিরিয়া যে সকল সন্ত্রাসবাদী কাণ্ডকীর্তি চালিয়ে আসছিল, সেগুলোর ধর্মই বা কি? তা কি ইসলাম ? যদি তা-ই হয়, তাহলে এই ইসলাম এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে তফাৎটা কোথায় ? এটা কি সত্য নয় যে, কর্নেল গাদ্দাফির 'গ্রীন বুক' (সবুজ পুস্তক) শুধু তার প্রচ্ছদেই 'গ্রীন' (সবুজ) ? এই বইটার বিষয়–বস্তুতো আগা গোড়াই সম্পূর্ণ লাল।

ইরানের অথবা লিবিয়ার মুসলিম 'মৌলবাদীদের' সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে যদি 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ' বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে ইসলামের রঙ হবে গাঢ় সবুজ – ডার্ক গ্রীন। এটা একটা তাজ্জবের ব্যাপার যে, ইসলামের যে ধারণা (কন্‌সেপ্ট), তা কী করে স্বয়ং স্ববিরোধী হতে পারে, এবং কী করে তা একই সঙ্গে সবুজও হতে পারে লালও হতে পারে ! যদি কিছু বলতেই হয়, তাহলে লিবিয়ার সন্ত্রাসবাদকে বলতে হবে যে, সেটা হচ্ছে ছদ্মবেশে জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসবাদ। এই প্রসঙ্গে, যে কেউ কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কথা ত বলতে পারেন। ফিদেল ক্যাস্ট্রো তো তার দমন–পীড়নও সন্ত্রাসবাদে কর্ণেল গাদ্দাফিকে বহু দূর ছাড়িয়ে গেছে। তবু তো এমন কথা কেউ কখনও শোনেনি যে, তার কার্যকলাপকে বলা হচ্ছে 'খৃষ্টান সন্ত্রাসবাদ'।

কথাতেই কথা আসেঃ সন্ত্রাসবাদের আলোচনা থেকে যে কারো দৃষ্টির সামনে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা ভেসে ওঠতে পারে। এক সময় খৃষ্টধর্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই বহু বীভৎস অত্যাচার ও নির্যাতনে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। অনেক খৃষ্টান রাজা–বাদশাহ ও সন্ত্রাস, নির্যাতন ও দেশ থেকে বিতাড়নের নিষ্ঠুর সব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা এসব করেছেন এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তাঁরা যীশু খৃষ্টের (আঃ) ধর্মের সেবাই করছেন। 'কালো মৃত্যু'র (Black Death) এক সময়ে ১৩৪৮-৯ বৎসরগুলোতে, কি বহু ইহুদীকে তাদের বাড়ীতে ঘরের ভেতরে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় নি ? স্পেনিশ ইন্‌কুইজিশন – (রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের খুঁজে বের করে শাস্তিদানের জন্য চার্চ কর্তৃক গঠিত আদালত)–এর যুগে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের নির্দেশে এবং পরিচালনায় দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম ছিল। বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য অসহায় নারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল এই অভিযোগে যে, তারা ছিল ডাইনী। এবং তখনকার দিনে এই ধরনের একটা উদ্ভট ধারণাই প্রচলিত ছিল যে, খৃষ্টধর্মমতে ডাইনীগিরির শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।

এই সমস্ত কার্যকলাপের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের জড়িত থাকার ব্যাপারটা যতটাই হোক না কেন, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মানবতার বিরুদ্ধে তখন সে সকল অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল তা সবই ছিল এমন এক যুগের ঘটনা যে যুগে অজ্ঞতাই সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ছিল। কে জানে, মানুষ কখন বুঝতে শুরু করবে যে, একজন লোকের চরিত্র এবং তার ধর্মের শিক্ষার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। কেউ যদি এই দু'য়ের একটার সঙ্গে অপরটাকে ঘুলিয়ে ফেলে, এবং ধর্মকে তার অনুসারীদের চরিত্রের মানদণ্ডে বুঝতে চেষ্টা করে, তাহলে তো বহু প্রশ্ন দেখা দিবে। কেননা, প্রতিটি ধর্মেরই অনুসারীদের চরিত্র তো দেশে দেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, যুগে যুগে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন ভিন্ন হয়ে থাকে।

যীশু খৃষ্টের (আঃ) সেদিনের অনুসারীদের চরিত্রের সঙ্গে এদিনের পিনোচেটের চিলি অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার তাঁর অনুসারীদের পার্থক্যটা যে কত বড় প্রকট তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারা করবে খৃষ্টধর্মের প্রতিনিধিত্ব ? আমরা কি একথা বলার অধিকার রাখি যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব–যুদ্ধ, যাতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে,[১] সে যুদ্ধগুলো ছিল মানবতার বিরুদ্ধে খৃষ্টান যুদ্ধ ? দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে একমাত্র রাশিয়াতেই এক হিসেবে প্রাণহানি ঘটেছে ৬১ লক্ষেরও বেশী মানুষের। বসনিয়ার তিন–চতুর্থাংশ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর এত বিপুল পরিমাণে ক্ষতি সাধিত হয়েছে যে, তার হিসাব করাই অসম্ভব।[২]

এই বিপুল সংখ্যার প্রাণহানি এবং অপরিমেয় সম্পদ ধ্বংসের জন্য আমরা কি বলবো যে, এ সবই ছিল খৃষ্ট ধর্মের কাজ, অথবা আমরা কি খৃষ্টধর্মের উপলব্ধি অর্জন করবো সেই সকল প্রাথমিক খৃষ্টানদের থেকে যাঁরা এক গালে চড় খেলে অপর গাল পেতে দিতেন আঘাতকারীর সামনে, এবং যাঁদেরকে জীবন্ত অবস্থায় হিংস্র জন্তু দিয়ে খাওয়ানো হতো এবং জীবন্ত পুড়ে মারা হতো তাদের নিজেদের ঘরেই আবদ্ধ করে; অথচ, যারা কখনই সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাসের জবাব দিতেন না ? আমি তো এঁদেরকেই পসন্দ করবো, নির্দ্বিধায়।

যে কোন মুসলিম দেশে যে কোন ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটুক না কেন, সেটাকে পাশ্চাত্যে এই বলে চালিয়ে দেওয়া হয় যে, সেটা ছিল আসলে একটা 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ'।

অথচ, অনুরূপ ঘটনা অন্য কোন দেশে ঘটলে তাকে বলা হয় রাজনৈতিক বিবাদ। এই দিনে, এই যুগে বিচারের এই দ্বৈত মানদণ্ড ডবল স্ট্যান্ডার্ড কেন ? এর দরুন, যে কেউ অবাক হয়ে ভাবতে পারে যে, হয়তো খৃষ্টান সভ্যতার দৃশ্যতঃ প্রশান্ত অবস্থার তলদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণার একটা অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এটা কি তাহলে, মুসলিম শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে শত শত বৎসর ধরে যে 'ক্রুসেড' (ধর্মযুদ্ধ) চালানো হয়েছিল তারই একটা বিদ্বেষের রেশ? অথবা এটা কি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের পুরাতন সেই বিষাক্ত সুরাই নতুন বোতলে পরিবেশন ? সেই ধারণাটা, – ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, – তা তো অত্যন্ত আপত্তিকর। মুসলিম সরকারগুলোর যে যুদ্ধ-বিগ্রহ তার তো বিচার করা উচিত প্রচলিত রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রীতি-নীতির ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়।

সন্ত্রাসের সংঘটন সমাজের বহু প্রকার ব্যাধির উপসর্গাদির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আজকের দুনিয়ার মুসলমানরা জানেই না যে, কোন–পথে মুখ ফেরাতে হবে। জনসাধারণ এমন বহু ব্যাপারে অসন্তুষ্ট যেগুলোর উপরে তাদের কোনভাবেই কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা এখন তৈরী খাদ্য – যা ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের দ্বারা অথবা বিদেশী সব এজেন্ট ও ক্রীড়ণকদের দ্বারা। দুর্ভাগ্যবশতঃ, মুসলিম দেশগুলোতেও বহু নেতা তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্যেও ইসলামের সমর্থক পেতে চেষ্টা করে, যেমনটা ঘটেছিল পাকিস্তানে প্রয়াতঃ জেনারেল জিয়া-উল-হকের আমলে। রক্তাক্ত বিপ্লব ইসলামের দর্শনে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতএব, ইসলামী দেশগুলোতে এইরূপ বিপ্লবের কোন স্থান নেই, থাকতে পারে না।

আমি একজন ধর্মের লোক হিসেবে, এবং একটি আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় বা ফের্কার অনুসারীদের নেতা বা ইমাম হিসেবে -- যে সম্প্রদায়ের লোকেরা বিগত এক শতাব্দীকাল যাবৎ দমন-পীড়ন, সন্ত্রাস ও নির্মম সব অত্যাচারের কবলে পড়ে দিন কাটাচ্ছে--আমি সকল প্রকারের সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে অত্যন্ত তীব্রভাবে নিন্দা করি, ঘৃণা করি। কেননা, এটা আমার একটা গভীর বিশ্বাস যে, শুধু ইসলামই নয়, যে কোন সত্য ধর্ম - নাম তার যা-ই হোক না কেন - তা সন্ত্রাসকে সমর্থন করতে পারে না, সমর্থন করতে পারে না, আল্লাহ্‌র নামে নিরীহ নিরপরাধ নারী-পুরুষের, ছেলে-মেয়েদের রক্তপাতকে।

আল্লাহ্‌ই প্রেম, আল্লাহ্‌ই শান্তি !

প্রেম কভু ঘৃণার জন্ম দেয় না ;

এবং --

শান্তি কভু যুদ্ধের প্রতি ধাবিত করে না।

টীকাসমূহ

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সংগঠিত সৈন্যের মোট সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬০ হাজার এবং কেন্দ্রীয় শক্তির ২ কোটি ২০ লক্ষ ৮৫ হাজার। উভয় পক্ষের নিহতের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৭.৬ ভাগ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সর্ব্বোচ্চ সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ২৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৫ শ' ৬৬; এর মধ্য থেকে নিহত ও নিখোঁজের সংখ্যা ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৯ হাজার ৭ শ' ৫৮ (ধারণা যে, এরা সবাই মারাই গেছে)। এবং জখমীর সংখ্যা ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩ শ' ৩৯। (দ্রঃ - আর্থার গাই ইনোকঃ 'দিস ওয়ার বিজনেস'ঃ লন্ডন, বডলী হেড, ১৯৫১, এবং ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স)।

দি কার্নেগী এনডৌমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পীস-এর হিসাব অনুযায়ী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, বেসামরিক সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি এবং প্রাণনাশের ক্ষতিপূরণ বাদেও, খরচ হয়েছিল $ = ৪০০,০০০,০০০,০০০ ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জাতিগুলোর এক হিসাব অনুযায়ী, প্রত্যক্ষ খরচ হয়েছিল মোট $ = ১,০৯৮,৯৩৮,০০০,০০০ ।

২. ইউলিয়াম. জে. রোহ্‌রেনবেক, কলিন্স, এনসাইক্লোপেডিয়া, খন্ড ২৩, প্রবন্ধঃ 'ওয়ার কস্ট এ্যান্ড ক্যাজুয়েলটিজ'।